কঙ্কর সিংহ

ইসলাম ও নারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম ও নারী

কঙ্কর সিংহ

র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তনুশ্রী মুখোপাধ্যায়
নন্দিতা সিমলাই
পম্পা চৌধুরী
অর্পিতা ঘোষ
বৈশালী ঘোষ
বিদিশা রায়চৌধুরী
পল্লবী দত্ত চৌধুরী

তোদের একসূত্রে গেঁথে দিলাম।

—বড়মামা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত—

সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট (১৯৯৭, ২০০৭)
রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (১৯৯৯)
নির্বাচন, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৯৯)
বঙ্গভঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ (২০০১)

কলকাতা থেকে প্রকাশিত—

আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন (২০০২, ২০১০)
মনুসংহিতা এবং শূদ্র (২০০২, ২০০৬)
মনুসংহিতা এবং নারী (২০০৫, ২০১০)
বাংলার রেনেসাঁস : অন্ত্যজ আর শূদ্র (২০০৫)
ইসলাম ও পরধর্ম (২০০৫)
ইসলাম ও কোরান (২০০৮, ২০১০)
ধর্ম ও নারী : প্রাচীন ভারত (২০০৯)

অনুবাদ :

বার্ট্রাণ্ড রাসেল : কেন আমি ধর্মবিরোধী (২০০৯)
বার্ট্রাণ্ড রাসেল : সুখের সন্ধানে (২০১০)
সিমোন দ্য ব্যভোয়ার : দ্বিতীয় লিঙ্গ (২০১০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি —

প্রাককথন

নারী : অর্দ্ধেক মানবী ১১
কোরান ও নারী ১৩
কোরান : ইসলাম ও বিবাহ ১৮
ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগ : নারী ও অবরোধ ২৮
সর্বশক্তিমান আল্লাহ : পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ৩২
মানুষের সৃষ্টিরহস্য ৩৪
আল্লাহর রসুল ও নারী ৩৭
রসুলের উত্তরাধিকার ৪৯
কোরান ও জান্নাত ৫২
হাদীস ও নারী ৬০
কোরান-হাদীস : নারীর বিচার ৬৭
ইসলাম : নারী ও পুরুষতন্ত্র ৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাককথন

ইসলামের একমাত্র, পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ কোরান পড়ে লিখেছিলাম, 'ইসলাম ও পরধর্ম'। ইসলাম ধর্মানুসরণকারী না হয়েও ইসলাম-কে নিয়ে কিছু লেখা পছন্দ করেন না ইসলাম ধর্মানুগত মুসলমানরা। আমার অধিকারের সীমা তাতে লঙ্ঘিত হয়েছে বলে আমি মনে করিনি। তারপরও কোরান পড়েছি আমি, পড়েছি হাদীস। আমি অনুপ্রাণিত হলাম কোরান-হাদীসকে ভিত্তি করেই আরো কিছু লিখতে। তারই ফলশ্রুতি 'ইসলাম ও নারী'। এটা আমার কৈফিয়ৎ। ইসলাম সম্বন্ধে লেখা আমার প্রথম বইয়ের সাথে এই বইয়ের কোনও মিল নেই। আবার অমিলও নেই। দুটো বইয়ের বিষয় আলাদা হলেও মূল তথ্য একই গ্রন্থ থেকে আহরিত। সেটা পাঠকরা বুঝতে পারবেন। আমি মানুষের ব্যাক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিধি দিয়ে তার একটা সীমারেখা হয়তো টানা যায়, কিন্তু মানুষের মননের স্বাধীনতার কোনও সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না। কোনও ধর্মগ্রন্থ তা পারেনি। যতই সেই গ্রন্থ ঐশীবাণীর সংকলন হোক না কেন।

আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণীর সংকলন কোরান এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে থাকবে কিনা তা নিয়ে যুগে যুগে বিতর্ক হয়েছে, কোরানকে অবিচল রেখেই উপস্থাপন করা হয়েছে তার নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। সবার সব ব্যাখ্যা যে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তা নয়। সেই ব্যাখ্যাও যুগে যুগে পাল্টে গেছে। এক যুগের ব্যাখ্যা অন্য যুগে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে ব্যাখ্যার প্রকৃতি ও ধরণ। যখন সাধারণভাবে কোরানের অনেক আয়াতকে ব্যাখ্যা করা যায়নি, তখন তাকে বলা হয়েছে রূপক। কিন্তু এমন অনেক সাধারণ আয়াত রয়েছে যেগুলিকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করাটাই ভুল, সহজ কথা সেখানে সহজভাবেই বলা হয়েছে। আমি বর্তমান গ্রন্থে কোরানের যে সব আয়াত তুলে ধরেছি তার মধ্যে রূপকের অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে হয়নি। আমি এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই। কয়েকটা আয়াত ভুলভাবে চয়ন হতেও পারে। কোনও সহৃদয় পাঠক যদি সেই ভুলটা ধরিয়ে দেন তাঁর ঋণ স্বীকার করে নেব আমি।

হাদীস নিয়ে বিতর্ক ইসলামের ইতিহাসে অনেক বেশী। হাদীস রসুলের মৃত্যুর দুইশত বছর পরে সংকলিত হওয়ার কারণে এর প্রামাণ্যতা নিয়ে অনেকে হাদীসের প্রতি শ্রদ্ধাবান নন। এখানেই কোরান থেকে হাদীস আলাদা। কোন্ হাদীস প্রামাণিক অর্থাৎ সহিহ্ হাদীস আর কোন্ হাদীস নয় সেই বিতর্ক মুসলিম বিশ্বে সংকলনের প্রথম দিন থেকে অব্যাহত। বোখারী শরীফ হাদীস সংকলনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা পায়। আমি যে সব হাদীস তুলে ধরেছি তা মূলত বোখারী শরীফ থেকে, তাছাড়া অন্যান্য যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছি তা বহুল প্রচারিত এবং যে কোনও প্রামান্য হাদীস সংকলনেই পাওয়া যায়। তাই এইসব হাদীস নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে আমার কিছুই করার থাকবে না। কোরান যেমন মূলে পড়তে পারিনি তেমনি হাদীসও পারিনি। সেটা আমার অক্ষমতা। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে কোনও হাদীস ভুলভাবে উদ্ধৃত করার চেষ্টা করিনি।

এই গ্রন্থে আমি খুঁজেছি 'মৌল ইসলাম'কে। 'আধুনিক ইসলাম'কে নয়। ইসলাম সৃষ্টি থেকেই চিরন্তন ও সজীব, তার কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে দাবি করেন ইসলামের মৌল ধর্মবেত্তারা। ইসলামের কোনও আধুনিক রূপ হয় না বলেই মনে করেন তাঁরা। সোনার দুনিয়ার পাঠক এক হও!

www.amarboi.com

পাথরবাটির মত আধুনিক ইসলামের ধারণাটাই নাকি ভুল। ইসলাম জন্ম থেকেই নাকি আধুনিক ও অনন্য। তার রূপ পরিবর্তন সম্ভব নয়। এখানে একটা বিতর্ক রয়েছে। আমি সেই বিতর্কে ঢুকতে চাই না।

ইসলাম তাই মৌলবাদী ধর্ম। কোরানের প্রতিটি শব্দকে অবিনশ্বর ধরে নিয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামের সব আইন-বিধি-বিধান, তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে হাদীসের ব্যাখ্যা। কোরান-হাদীসকে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে শরীয়া, ইসলামের আইনশাস্ত্র। এই গ্রন্থের আলোচনায় কোরান-হাদীস বারে বারে উঠে এসেছে, কিন্তু শরীয়া তেমন ভাবে আসেনি। কারণ এই গ্রন্থের আলোচনায় আমি প্রাধান্য দিয়েছি কোরানকে। কোরান সব কিছুর উৎস।

একটা ধারণা ইসলামের ইতিহাসে ঢুকানো হয়েছে যে আরবে ইসলাম-পূর্ব রূপ ছিল অন্ধকার যুগ। তাদের ভাষায় আইয়ামে জাহেলিয়া। সেই যুগে আরব নারীদের অধিকার বলতে নাকি কিছুই ছিল না। আরব পুরুষরা ব্যাপকভাবে কন্যাশিশুকে হত্যা করত। এই গ্রন্থে তা নিয়ে আলোচনা আছে। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা নিয়ে সমগ্র আরব সমাজকে বিচার করা হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ সত্য হলে ইতিহাস অন্য কথা বলত। এটা ইসলামের ইতিহাসের অপপ্রচার। প্রাক ইসলামের যুগ যদি তমসাচ্ছন্ন হত তাহলে বিবি খাদিজার মত নারীকে দেখা যেত না। তিনি কী করে এত সম্পদের অধিকারী হলেন, এত বড় বণিক-ই বা হলেন কী করে, ইসলামের ইতিহাসে তার কোনও বিশ্লেষণ নেই। খাদিজা পাশে না থাকলে মোহম্মদ নতুন ধর্ম নিয়ে এক পা'ও অগ্রসর হতে পারতেন না। ইতিহাস সেভাবে কখনো তুলে ধরেনি তাঁকে। মোহাম্মদের জীবন নিয়ে কত গবেষণা অথচ খাদিজার জীবন নিয়ে তেমন কিছুই হয়নি। তাই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারিনা। এই গ্রন্থের আলোচনায় বার বার খাদিজা প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে আবার তাঁকে স্মরণ করলাম।

ইসলামে নারীর স্বাধীনতা নেই। বার বার তা বলা হয়েছে কোরানে-হাদীসে, শরীয়ায়। রসুলের পত্নীগণকে পর্যন্ত কোরান নির্দেশ দিয়েছিল রসুলের মৃত্যুর পরে গৃহে অবস্থান করতে, যদিও তাঁরা ছিলেন মোহাম্মদের উম্মতদের জন্যে জননী স্বরূপা। রসুলের আরেক পত্নী বিবি আয়েশা খলিফা হজরত আলীর বিরুদ্ধে জঙ্গে জামালের যুদ্ধে (উঠের যুদ্ধ বলে খ্যাত) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আধুনিক ইসলাম এই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেন ইসলামের উদয়ে নারী প্রগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে। কিন্তু তারা ভুলে যান রসুল-পত্নী আয়েশা পরে এই ঘটনার জন্যে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। কারণ রণাঙ্গন নারীর জন্যে নয় এটাই ইসলামের নির্দেশ। আয়েশাকে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। বিবি হাওয়ার অনুতপ্ত হওয়ার কথা লেখা আছে ইসলামের ইতিহাসে।

ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম। কোরান-হাদীসের ব্যাখ্যায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইসলামে গণতন্ত্র নেই। তার ধ্যান-ধারণাও নেই যতই দাবি করা হোক না কেন। শাসনব্যবস্থায় আছে খেলাফত ও রাজতন্ত্র। কিন্তু মুসলিম দেশে দেশে যখন নারীরা ক্ষমতার শীর্ষে চলে গেছেন, —বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক বা ইন্দোনেশিয়ায়;তখন কোরান হাদীসের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন মৌল ইসলাম বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা নারী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন এই বলে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তা নারীর একার শাসন নয়, বহু লোকের শাসন নারী-পুরুষ মিলিয়ে। তাই এই ব্যবস্থায় নারীর নেতৃত্ব মেনে নিলেও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। অভিনব ব্যাখ্যা। মৌল ইসলামকে এইভাবে বাঁচানোর চেষ্টা হলেও তা যে কোরান-হাদীসকে এড়িয়ে যাওয়া তা বুঝেও বুঝে উঠতে চান না তাঁরা।

(সূত্র—বোখারী শরীফ—২৬৬৩'র ব্যাখ্যা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গ্রন্থে মুসলিম বিবাহ, তালাক ও পুনর্বিবাহ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এইসব ব্যাপারে কোরান ও হাদীসের নির্দেশ খুব স্পষ্ট। কোরান অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয়। শরীয়ত গড়ে উঠেছে কোরান ও হাদীসকে উৎস ধরে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে যে মুসলিম দেশে দেশে বিবাহ, তালাক ও পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত নতুন আইন তৈরী করতে গিয়ে এই সম্পর্কে কোরান-হাদীসের যা কিছু আদেশ-নির্দেশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তাতে কোরান-হাদীসকে লঙ্ঘন করা হয়েছে বলেই মনে করা যায়। অনেক মুসলিম দেশ যাদের পরিচয় ইসলামিক প্রজাতন্ত্ররূপে, বা যাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তারাও কোরানের নির্দেশ অতিক্রম করে আধুনিক বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন তৈরী করেছে। বহু দেশেই মুসলমান পুরুষের 'মৌলিক অধিকার' বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার যে অসম্মানকর বিধি কোরানের, তা নিষিদ্ধ হয়েছে। যে সব দেশ নতুন আইন তৈরী করে নারীকে মুক্তি দিয়েছে বহু শত বছরের অসম্মানের হাত থেকে তা নিঃসন্দেহে কোরানকে অতিক্রম করে, না হয় এড়িয়ে গিয়েই তা করেছে। তাতে কোরান অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু কোরানকেও যে অতিক্রম করা যায় শরীয়া আইনের এই সব সংস্কার তা বুঝিয়ে দেয়। মৌল ইসলাম অপরিবর্তিত থাকলে মুসলিম নারীর কল্যাণ আসবে না। এই যে কোরানকে অতিক্রম করা—এটা আধুনিক ইসলামের বিজয়, কিন্তু মৌলবাদী মুসলমানরা এই পরিবর্তন ভালভাবে গ্রহণ করেননি। তার নমুনা মুসলিম দেশে দেশে দেখা যাচ্ছে।

ইসলামকে বলা হয় ত্যাগের ধর্ম। কিন্তু ইহলোকে তার যে রূপই থাক্, পরলোকে মুসলমান পুরুষের জন্যে যে প্রলোভন তা ভোগের চূড়ান্ত রূপ। বলা যায় একেবারে শেষ সীমা। কিন্তু তা শুধু মুসলমান পুরুষের জন্যে। মুসলমান নারীর জন্যে নয়। মুসলমান পুরুষের মানসলোকে পরলোকের যে ছবি ফুটিয়ে তোলে কোরান ও হাদীস -- তাকেই বলা হচ্ছে জান্নাত। কোরান ও হাদীসের আলোকে জান্নাত নিয়ে আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে নারীর সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে বলে।

নারীকেই শুধু খুঁজে দেখা হয়েছে এই গ্রন্থে। সহজ ভাবে সহজ কথা বলতে চেয়েছি আমি। তাতে দেখার যদি কোনও ভুল হয় সেই দায়িত্ব আমার। আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'ইসলাম ও পরধর্মে'র সাথে মিল রয়েছে এইখানে। আর অমিল কোথায় তা পাঠকরা বুঝতে পারবেন। ইসলাম নিয়ে আমার অনেক জিজ্ঞাসা, এই গ্রন্থেও সেই জিজ্ঞাসার কিছু উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থেও লেখার বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সংগতিপূর্ণ কোরানের বিভিন্ন সুরা থেকে কোনও কোনও আয়াতের বাংলা অনুবাদ আমি তুলে ধরেছি। তেমনি বিভিন্ন হাদীস সংকলন থেকেও কিছু হাদীস তুলে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই ধরনের নির্বাচনে ও চয়নে এইসব মহাগ্রন্থকে দেখতে হয় খণ্ডিতভাবে। তাতে অনেক আয়াত বা হাদীস সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই ব্যাপারে যতদূর পারা যায় সচেতন থাকার চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য রেখেছি কোথাও যেন নির্বাচিত আয়াত তার প্রাসঙ্গিক অর্থ হারিয়ে না ফেলে। নির্বাচিত আয়াতের বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করেছি ঢাকা থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের 'কোরান শরীফ-সরল বঙ্গানুবাদ' থেকে। বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের পরিচয় তুলে ধরার মনে হয় প্রয়োজন নেই। 'বোখারী শরীফ'এর অনুবাদ নেওয়া হয়েছে মাওলানা আজিজুল হকের সম্পাদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ থেকে। আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থে কোরানের বাংলা অনুবাদের সাথে ইংরেজি অনুবাদও দেওয়া হয়েছিল। অনেক পাঠক বলেছেন আলাদা ইংরেজি অনুবাদের কোনও প্রয়োজন নেই। তাই এই গ্রন্থে কোরানের আয়াতের কোনও ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করা হয়নি।

কোরান কালোত্তীর্ণ ধর্মগ্রন্থ। কোনও কালসীমার বন্ধনে নাকি এই ধর্মগ্রন্থকে নিয়ে আলোচনা করা যায় না। যাদের এই বিশ্বাস দৃঢ় তাদের সাথে এটা নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিন্তু তাদের বিশ্বাসে আমি আঘাত দিতে চাইনি। আমি নিজের কথাই বলতে চেয়েছি। কেউ যদি আমার আলোচনায় আঘাত পেয়ে থাকেন আমি মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

আলোচনায় অনেক পণ্ডিত, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের রচনা ও গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। সব উদ্ধৃতির উৎস যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরও অনবধানবশত কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। তার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই গ্রন্থ রচনায় অনেক বন্ধু ও প্রিয়জনের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি। যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সে দুজন হলেন আমার পরমাত্মীয় ডাঃ রণজিৎ বারুই এবং প্রিয়তম বন্ধু দিলীপ মিত্র। অনেক বই সংগ্রহ করে দিয়ে রচনায় সহায়তা করেছেন স্নেহভাজন এন. জুলফিকার এবং শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী। ঢাকা থেকে কিছু তথ্য পাঠিয়েছেন বন্ধু স্থপতি সফিউদ্দিন আহমেদ। প্রিয়জনদের কৃতজ্ঞতা জানানো শোভন নয়।

আমার এই গ্রন্থও প্রকাশিত হল র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন থেকে। এর কর্ণধার শ্রী অরুণকুমার দে'কে কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন শ্রী অদীপ চক্রবর্তী। তাঁকে ধন্যবাদ।

কলকাতা

নভেম্বর, ২০০৬

কঙ্কর সিংহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী : অর্দ্ধেক মানবী

নারী বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বিধাতাকে নিয়ে আপাতত আমাদের কোনও আলোচনা নেই। আমাদের আলোচনা শুধু 'নারী' নামে বস্তুটিকে নিয়ে। "নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত পশু"—বলেছেন ভার্জিনিয়া উলফ, বস্তু থেকে পশু। এইটুকুই শুধু ক্রমবিবর্তন। তার বেশী নয়। মহাবিশ্বে হাজার হাজার বছরের পরম্পরায় নারীকে দেখা হয়েছে বস্তু হিসেবে। না হয়, উন্নত পশু হিসেবে। মানুষ হিসেবে নয়। নারী শুধুই নারী। মানুষ নয়, "কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে"—বলেছেন সিমোন দ্য বোভোয়ার। নারী কী হয়ে জন্ম নেয় তা বড় কথা নয়, তবে তাকে মানুষ হিসেবে থাকতে দেয়া হয় না, তাকে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয় নারীরূপে। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"শুধু বিধাতার সৃষ্ঠ নহ তুমি নারী
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারী
আপন অন্তর হতে।"

নারীকে বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টিরূপে দেখতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। হুমায়ুন আজাদ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন পুরুষের এক মহৎ প্রতিনিধিরূপে। তিনিও নারীকে দেখেছেন শুধু দয়িতা আর মানস-প্রতিমা রূপে। নারী তাঁর কাছে কাব্যলক্ষ্মী—পূর্ণ মানবী নয়। রবীন্দ্রনাথের "চোখে পড়েছে শুধু নারীর চারপাশের বর্ণ, গন্ধ, ভূষণ, যাতে নারীকে সাজিয়েছে পুরুষ। নারীর প্রতি পুরুষসুলভ করুণা এবং পুরুষ হওয়ার গর্বও তিনি বোধ করেছেন গভীরভাবে। পুরুষ প্রেম আর আলিঙ্গনেও ভুলতে পারে না সে প্রভু, নারীর স্রষ্টা, . . . নারী সৃষ্টিতে তিনি বিধাতার সাথে পুরুষের ভাগ দাবি করেছেন এবং অস্বীকার করেছেন নারীর সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে।" রবীন্দ্রনাথের কাছে নারী "অর্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা"। এখানে কবিগুরু যেন ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছেন বিধাতাকে। রবীন্দ্রনাথ পুরুষকে বলেছেন নারীর দ্বিতীয় বিধাতা। দার্শনিক আরিস্টটল বলেছেন, "নারী কিছু গুণের অভাববশতই নারী। আমরা মনে করি স্বাভাবিক ভাবেই নারীস্বভাব বিকারগ্রস্ত।" আরিস্টটল নারীকে স্বাভাবিক মানুষরূপে দেখতেই চাননি, দেখেছেন অসম্পূর্ণ ও বিকারগ্রস্তরূপে। তাই নারী পূর্ণ মানুষ নয়। অর্দ্ধ মানুষও বোধহয় নয়। তার চেয়েও কম, দার্শনিক প্লেটোকে অনেকে মনে করেন নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত, কিন্তু তাঁর এই সংলাপটি তো বিখ্যাত, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে এথেন্সবাসী করেছেন, বর্বর করেননি। তাঁকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে মুক্ত পুরুষ করেছেন, স্ত্রীলোক বা ক্রীতদাস করেননি।" প্লেটোর কাছে এথেন্স ছাড়া আর সব জায়গা ছিল বর্বরদের স্থান। দাস ও স্ত্রীলোকের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেননি প্লেটো। তিনি বলেছেন মানব চরিত্র দুটো ভাগে বিভক্ত—উচ্চতর ভাগটি পুরুষ চরিত্র। প্লেটো আরো বলেছেন—দুষ্ট ও ভীত পুরুষ পরজন্মে নারী হয়ে জন্মায়। সন্ত টমাস মনে করেছেন "নারী হচ্ছে বিকৃত মানুষ এক অবাস্তব সত্তা"। সন্ত টমাস, প্লেটো কিংবা আরিস্টটলের অনুভূতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

আলাদা নয়। তাঁরা সকলেই পুরুষতন্ত্রের উজ্জ্বল প্রতিনিধি। সন্ত টমাস না হয় পুরুষ বিধাতার প্রতিনিধি। তিনি নারীকে 'বিকৃত পুরুষ' রূপেই দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু মহৎ, পূজনীয় দার্শনিকরা কেন নারীকে নিগুর্ণা ভাবলেন তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। তাঁরা শুধু পুরুষের জয়গান গেয়ে গেলেন, নারীর নয়।

মধ্যপ্রাচ্যের তিন সেমেটিক ধর্ম— ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম। তিন ধর্মেই নারী সৃষ্টির একটি সাধারণ কাহিনী রয়েছে। খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিল, যার উল্লেখ বারবার দেখা যায় কোরানে। সেখানে বিধাতাপুরুষের নারী সৃষ্টির বর্ণনা রয়েছে, "সদাপ্রভু ঈশ্বর আদি মানব আদমকে নিদ্রায় মগ্ন করলে তিনি নিদ্রিত হলেন, ঈশ্বর তখন আদমের পাঁজরের একটা হাড় নিয়ে তা মাংস দিয়ে পূরণ করেন। সদাপ্রভু আদম হতে গৃহীত সে পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করে আদমের কাছে নিয়ে আসেন, তখন আদম বলেন এই স্ত্রী তাঁর অস্থির অস্থি। এঁর নাম হবে নারী। কেননা তিনি নর হতে তৈরী হয়েছেন।" এই কাহিনীটি দেখা যায় কোরানেও। আদম কোনও নারী সন্তান নন, তাঁর কোনও জননী নেই, স্বয়ং বিধাতা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। মানবের আদি পিতার জন্ম মৃত্তিকা হতে। সেমেটিক ধর্মসমূহের স্রষ্টা তা বারবার ঘোষণা করেছেন ধর্মপুস্তকে। তৌরাত, ইঞ্জিল, কোরানে। ইহুদী-খ্রিস্টান-ইসলাম—তিন ধর্মেই অস্বীকার করা হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক জন্মপ্রক্রিয়া। শুধু তাই নয়। নারীকে করে তুলেছে তার সৃষ্টির জন্যে পুরুষের দেহের কাছে ঋণী। পুরুষের পঞ্জর না হলে নারী সৃষ্টি হত না। পুরুষ তার অন্য বিধাতা। ঈশ্বরের ধর্মগ্রন্থে নর নারীর জন্মদাতা। যে অস্থিপঞ্জর থেকে নারীকে সৃষ্টি করা হল সেই পঞ্জরও আবার সহজসরল নয়—বক্র। বক্র হাড় থেকে জন্ম বলে নারীর স্বভাবও বক্র। তাকে নিন্দা করেই এরপর ধরনীর ধূলায় নেমেছেন ঈশ্বরের প্রেরিত দূত—নবী রসুলরা, বিধাতাপুরুষের সাথে তাঁরাও কণ্ঠ মিলিয়েছেন নারী নিন্দায়। যে নারীনিন্দা তাঁদের অনুগামী পুরুষদের কাছে হয়ে উঠেছে পবিত্র ধর্মপুস্তক, কখনও তা ঈশ্বরের ঐশীবাণী, কখনও তা প্রেরিত পুরুষের জীবন বিধান ও কর্মনির্দেশ। যাকে অবনত মস্তকে শুধু মেনে নিতে হয়। অবহেলা কিংবা অস্বীকার করা যায় না। করলেই ধর্মচ্যুতি। যার জন্যে রয়েছে চরম জাগতিক শাস্তির বিধান। এইসব ধর্মপুস্তক, বিধি-বিধান হয়ে উঠেছে সব সামাজিক ও জাগতিক আইনের উৎস। যা ক্রমাগতভাবে পুরুষকে তৈরী করে দিয়েছে নারীর বিধাতারূপে। তাকে আষ্টে-পৃষ্টে করেছে শৃঙ্খলিত। নারী সেই শৃঙ্খল খুলতে পারেনি। কারণ আইন হল বিধাতার। নির্দেশও তাঁর প্রেরিত পুরুষ দ্বিতীয় বিধাতার।

শুধু সেমেটিক ধর্ম নয়—পৃথিবীর কোনও অঞ্চলের কোনও ধর্মই নারীকে মানুষরূপে দেখেনি। উদার, মানবতাবাদী বলে প্রচারিত অবতার, প্রেরিত পুরুষ, ধর্ম সংস্কারক, শাস্ত্রকার বা মহাপুরুষ নামে যাঁরা নিজেদের পূজনীয় করে তুলেছেন মানুষের কাছে, তাঁদের রচিত প্রচারিত ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থ দিয়ে তাঁরা নারীকেই শুধু শৃঙ্খলিত করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনা শুধু একটি বিশেষ ধর্মের ধর্মপুস্তকে নারীর অবস্থান নিয়ে। আমরা যেহেতু আলোচনা করব শুধু সেমেটিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত 'ইসলাম' ধর্ম নিয়ে, তাই ইসলাম ধর্মপুস্তক কোরান-হাদীসের মধ্যেই নারীকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরান ও নারী

ইসলাম পৃথিবীর স্বীকৃত ধর্মগুলির মধ্যে কনিষ্ঠতম ধর্ম। হজরত মোহাম্মদ এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। যদিও ইসলাম ধর্মানুসারীদের বিশ্বাস সৃষ্টির আদি পিতা আদম হতে ইসলামের উদ্ভব। আদম ইসলামের প্রথম নবী। এখানে একটা বড় বিতর্ক আছে—সেমেটিক ধর্মসমূহের মধ্যে। আমরা আলোচনার শুরুতেই সেই বিতর্কে ঢুকব না। আমাদের জন্যে তা প্রয়োজনীয়ও নয়। হজরত মোহাম্মদকে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক রূপেই আমরা ধরে নেব। মোহাম্মদের জন্ম আরবভূমির মক্কানগরীতে, কোরাইশ বংশে। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা খাতুন। আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যে ধাত্রীর স্তন্যপান করেছেন মোহাম্মদ শৈশবে তাঁর নাম হালিমা খাতুন। আরব দেশে ধাত্রীমাকে জননীর মর্যাদা দেওয়া হয়। মোহাম্মদের জীবনকথা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

মোহাম্মদের যখন ৪০ বছর বয়স তখন পবিত্র রমজান মাসে তার ওপর প্রথম 'ওহী' নাজেল হয়। বলা যায় সেই হল ইসলাম ধর্মের জন্ম মুহূর্ত। নতুন সেই ধর্মের প্রবর্তক হলেন মোহাম্মদ। তিনি হয়ে গেলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা দূত। মোহাম্মদ লাভ করলেন নবুয়ত। ওহী শব্দের সাধারণ অর্থ হল ঈশ্বরের প্রেরিত ঈশীবাণী বা প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশ লাভ করেই মোহাম্মদ হলেন আল্লাহর রসুল বা নবী। প্রথম অবতীর্ণ হওয়া প্রত্যাদেশ বা ওহী হল কোরানের সুরা আলাক। এই সুরাই সৃষ্টি করল কোরান, জন্ম নিল ইসলাম ধর্ম। তারপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে রসুল মোহাম্মদের ওপর ওহী নাজেল হয়। বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে গ্রন্থিত হয়েছে ওহী। সেই ওহী নাজেল হয়েছে ইসলাম ধর্মানুসারী মুসলমানদের জন্যে নীতি-নির্দেশ উপদেশ নিয়ে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জীবনচর্চা ও জীবনচর্যার বিস্তারিত বিধান নিয়ে। অনেক ওহী নাজেল হয়েছে মোহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার সমাধান দিয়ে তা নবদীক্ষিত মুসলমানদের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে। মোহাম্মদের জীবনাবসান ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে। শেষতম ওহী নাজেল হয় তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে। হজরত মোহাম্মদের ওপর যত ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তা 'অবিকৃতভাবে' সংকলিত রয়েছে কোরানে। মুসলমানদের দাবি ওহী যে ভাবে নাজেল হয়েছিল, তা যেভাবে গ্রন্থিত করেছিলেন রসুল মোহাম্মদ তা থেকে একটি অক্ষর কিংবা যতিচিহ্ন পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি সুদীর্ঘকালেও। কোরান আল্লাহর ওহী। কোরানে কোনও কিছু যুক্ত, বিযুক্ত কিংবা প্রক্ষিপ্ত করা সম্ভব নয় বলেই বিশ্বাস করেন মুসলমানরা। অবতীর্ণ হওয়া ওহীর ধারাবাহিকতা মেনে কোরান গ্রন্থিত হয়নি। কিন্তু কেন কোরানের প্রচলিত সংকলনে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হল না, তার কোনও সদুত্তর মেলেনি বিশিষ্ট সব কোরান বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদদের কাছে। অথচ তা অসম্ভব ছিল না। তবে কী কোরানের স্রষ্টা এইভাবেই চেয়েছিলেন সেই ওহীর সংকলনকে। কিন্তু এর উত্তর পেতে হলেও আরেকটা ওহীর প্রয়োজন। কিন্তু তা তো আর পাওয়া যাবে না। মোহাম্মদ যে আল্লাহর শেষ নবী। আখেরী পয়গম্বর, এরপর আর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও নবী ধূলার ধরণীতে আসবেন না, অবতীর্ণ হবে না কোনও ওহী। আখেরী ওহী যে নাজেল হয়ে গেছে। এই হল ইসলামের চূড়ান্ত বিশ্বাস (Ultimate Truth)। মোহাম্মদ কোরানকে ধারণ করেছিলেন, অনেক সুরা ও আয়াত লিখেও রেখেছিলেন। বেশীটাই ছিল হাফেজ (কোরান মুখস্ত যাঁদের আছে) দের কণ্ঠে। কিন্তু কোনও সংকলিত রূপ দিয়ে যাননি বা যেতে পারেননি। কোরান পুর্ণাংগরূপে সংকলিত হয় মোহাম্মদের মৃত্যুর দুই দশক পরে ইসলামের ৩য় খলিফা হজর্‌ত ওসমানের হাতে। খলিফা ওসমানকে তাই বলা হয় 'জামেউল কোরান' বা কোরান সংকলক। এই কোরান সংকলন নিয়েও ইসলামের ইতিহাসে অনেক বিতর্ক আছে। আমাদের আলোচনার জন্যে তা প্রাসঙ্গিক নয়।

মক্কার কাছে হেরা পবর্তে প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল মোহাম্মদের ওপর তা সুরা আলাক।

> পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে।
>
> —সুরা আলাক, ৯৬/১-২

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদে আছে রক্তপিণ্ডের পরিবর্তে 'ঘনীভূত শোণিত যোগে'। রক্ত ঘনীভূত-ই হোক আর বিন্দু বিন্দু হোক অর্থের তফাৎ হয় না। এই ওহীতে মানুষ সৃষ্টির কথা আছে—কিন্তু আলাদাভাবে নারী সৃষ্টির কথা নেই, যুগল নারীপুরুষের কথাও নেই। এই মানুষ সৃষ্টি যদি মানব প্রজাতি সৃষ্টি বলে ধরে নেই তাহলে এই সুরা আলাক পূর্ণতা পেতে পারে। কিন্তু কোরানের কোনও তফসিরকার সুরা আলাককে সেভাবে ব্যাখ্যা করেননি, তাই আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ এখানে শুধুই পুরুষ। নারীর কথা তখনো মনে হয়নি তাঁর।

বর্তমানে কোরানকে যেভাবে পাওয়া যায় তাতে 'নারী'র প্রথম দর্শন দেখা যায়—সুরা বাকারায়। মদীনায় এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সুরার আত্মপ্রকাশ তাই মোহাম্মদের নবুয়ত লাভের অনেক পরের দিকে।

সুরা বাকারার সেই বিখ্যাত আয়াতটি তুলে ধরছি —

> তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার।
>
> —সুরা বাকারা, ২/২২৩

কোরানের এই আয়াত নারীকে একেবারে পৌঁছে দিয়েছে পৃথিবীর আদিমতম সমাজে। নবীন ধর্ম ইসলামের অনুগত মুসলমানদের জন্যে এই আয়াতের 'নির্দেশ' নারীর জন্যে চরম অবমাননার। এখানে নারীর অবনমন চূড়ান্ত। প্রাচীন বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই মনে করা হত যে নারীর সাথে উর্বরা প্রকৃতির কোনোও প্রভেদ নেই। প্রকৃতির ক্ষেত্রকে কর্ষণ করলে যেমন শষ্য পাওয়া যায়, নারীকে মৈথুন করলেও তেমনি সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান জন্মে নারীর কোনও ভূমিকা নেই। যেমন নেই শষ্যক্ষেত্রের। কর্ষণ করে বীজ বপন করলে শষ্য আর মৈথুনের বীজ থেকে সন্তান। এই আয়াত নারীকে শুধু পদানতই করেনি, তাকে পরিণত করেছে পুরোপুরি যৌন কর্ষণের ক্ষেত্ররূপে। নবীনতম ধর্ম ইসলাম দাবি করে, এই ধর্ম নারীকে যত অধিকার দিয়েছে বিশ্বের অন্য কোনও ধর্ম তা দেয়নি। দিতে পারেনি। ইসলাম নারীকে অন্ধকার যুগ থেকে তুলে এনে নতুন মহিমায় গরিয়সী করেছে। ইসলাম নারীকে কোনও ভাবেই মহিয়সী করেনি। নারীকে উর্বরা শস্যক্ষেত্রের সাথে উপমা তাকে আদিম থেকে আদিমতম স্তরে অবনমিত করে। সুরা বাকারার ২/২২৩ আয়াত সেটাই বুঝিয়ে দেয় আমাদের।

কোরানের প্রথম সুরা, সুরা ফাতিহা, যে সুরাকে বলা যায় কোরানের ভূমিকা। বিশ্বজগতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা এবং বন্দনা। দ্বিতীয় সুরা, সুরা বাকারা। এই সুরার ২/২২৩ আয়াত আমরা তুলে ধরেছি। এরপর এই সুরার নারী সংক্রান্ত অন্য আয়াতগুলি আমরা তুলে ধরছি।

রোজার রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে।

—সুরা বাকারা, ২/১৮৭

রমজান মাস মুসলমানদের জন্যে সংযমের মাস, রিপুকে দমনের মাস। সেই পবিত্র মাসেও মুসলমানদের জন্যে স্ত্রী-সহবাস হালাল করে দিলেন আল্লাহ এই আয়াতে। ত্যাগের মাস, সংযমের মাস রমজানেও নব দীক্ষিত মুসলমানরা তখন স্ত্রীসম্ভোগ করতেন। তাদের বাঁধভাঙ্গা যৌনতা রোজার মাসে শান্ত রাখা যেত না। রসুল মোহাম্মদ নিজেও রোজার মাসে স্ত্রীসম্ভোগ করতেন। হাদীসে তার উল্লেখ রয়েছে।

মোহাম্মদের পত্নী আয়েশা এবং উম্মে সালমা উভয়েই বলেছেন যে কোনও কোনও সময় রসুল স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের পর 'জানাবত' অবস্থায় সোবেহ সাদেক (রাত্রি শেষে প্রত্যুষের আলো ফোটার আগের মুহূর্ত) হয়ে যেত। তখন তিনি স্নান করতেন এবং রোজা রাখতেন।

(৯৯৫/বোখারী শরীফ, মাওলানা আজিজুল হক অনূদিত।)

এই আয়াত কেন প্রয়োজন হয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারি। এ নিয়ে মনে হয় একটা বিতর্ক ছিল নতুন ধর্মের অনুসারীদের। তাই এই আয়াতের অবতরণ। পবিত্র রোজার মাসেও যৌন সংগম হালাল করে দিলেন আল্লাহ।

মূর্তিপূজারী কাফের রমণীকে ধর্মান্তরিত না করে বিয়ে করা যায় না। কোরানের নির্দেশ তাই।

আর অংশীবাদী রমণী যে-পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা তাকে বিয়ে কোরো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো।

—সুরা বাকারা, ২/২২১

মুসলমানদের জন্যে এই নির্দেশ এখনো বহাল। ইসলামের সমাজব্যবস্থায় বৈবাহিক সম্বন্ধে এই মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হলে মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। সে ধর্মচ্যুত হয়ে যায় অপবিত্র অবিশ্বাসী রমণীকে ঘরে তোলার কথা চিন্তা করলে। একজন আধুনিক মুসলমানও তাই বিয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন, না হলে তার ইমান নষ্ট হয়ে যায়।

কোরানেও রজঃস্বলা নারীকে দেখা হয়েছে নিষিদ্ধ ও দূষিত প্রাণী রূপে। এখানে ইসলামের বিধান পুরুষতান্ত্রিক অন্যসব ধর্মের চেয়ে আলাদা নয়। ইসলাম এখানে কোনও আধুনিকতার পরিচয় দিতে পারেনি। রজঃস্রাব চলাকালীন নারী অশুচি হয় না। তবে তার প্রয়োজন হয় বিশ্রামের, বিশেষ করে যৌনসংগম থেকে।

লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো, 'তা অশুচি', তাই রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে। —সুরা বাকারা; ২/২২২

ঋতুমতী নারীর রজঃ অশুচি। এই বার্তা কোরানে বলা হলেও রসুল মোহাম্মদ কামুক পুরুষদের জন্যে স্ত্রী সংসর্গ পুরোপুরি বন্ধ করেননি। তিনি ইচ্ছা করেই যেন কোরানকে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি অবশ্য কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

রজঃস্বলা স্ত্রীর সাথে কোনও পুরুষ সংগত হলে তাকে এই কাজের জন্যে এক দিরহাম সদকা (charity) দিতে হবে। রক্তের রং কিছুটা হলদেটে হলে সদকার পরিমাণ হবে অর্দ্ধ দিনার আর সম্পূর্ণ লাল হলে এক দিনার। (মিশকাত—৫৫৩, ৫৫৪)

কোরান যা নিষিদ্ধ করেছে তা থেকেও রেহাই পাওয়া যায় কিছু সদকা দিলে যদি তা স্ত্রী সংসর্গ জনিত হয়। সমর্থ পুরুষের জন্যে এই সদকা সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়। যৌন-সংযম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে কিছু যেন থাকতে নেই ইসলামে। ইসলাম নারীকে দেখেছে মূর্তিমতী কাম বলে, যে নারী একদিন তাকে করেছিল স্বর্গভ্রষ্ট, লিপ্ত করেছিল 'পাপকাজে'। সে নারীকে ইসলাম ক্ষমা করেনি।

সুরা নিসা কোরানের চতুর্থ সুরা, 'নিসা' শব্দের অর্থ নারী। সুরার নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এই সুরাতে নারীসংক্রান্ত বিধি-বিধান, নির্দেশ-উপদেশ তুলে ধরা হয়েছে। এই সুরাও মদীনায় অবতীর্ণ। ততদিনে হজরত মোহাম্মদ নতুন ধর্মকে একটা সুনির্দিষ্ট অবয়ব দিতে চেষ্টা করেছেন। সুরা নিসায়ও বিবাহ, এতিমদের প্রতি আচরণ, সর্বোপরি নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বিস্তারিত বিধান রয়েছে। ইসলাম দাবি করে নারীকে সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রদান এর আগে কোনও ধর্ম-সমাজ দেয়নি, এটা এক বৈপ্লবিক উদাহরণ। ইসলাম পুরুষের সাথে নারীকেও সম্পত্তির অধিকারী করেছে। ইসলাম নারীকে সম্পত্তির অধিকার দিলেও সমান অধিকার দেয়নি, সব স্থানেই নারী পুরুষের অর্দ্ধেক। অর্থাৎ একজন পুরুষের সমান দুজন নারী। পিতা-মাতা- ভ্রাতা-স্বামী-পুত্র—সবার সম্পত্তিতেই নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত হলেও তা নিরংকুশ নয়। সেখানেও লিঙ্গ-বৈষম্য তাকে পূর্ণ মানব না করে অর্দ্ধমানবী করে রেখে দিয়েছে।

সুরা নিসার ৭, ১১ এবং ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

> পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে। আর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।
>
> আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে: এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান; যদি দুই মেয়ের বেশি থাকে তবে তারা পাবে যা সে রেখে গেছে তার দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি এক মেয়ে থাকে তবে সে পাবে অর্ধেক, আর তার যদি সন্তান থাকে তবে তার পিতামাতা প্রত্যেকে পাবে তার ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তার সন্তান না থাকে, শুধু পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ; কিন্তু যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ।
>
> তোমাদের স্ত্রী যা রেখে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। যদি তাদের একটি সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের রেখে-যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, তাদের অসিয়তের দাবি বা ঋণ পরিশোধের পরে। আর তারা পাবে তোমরা যা রেখে যাও তার চার ভাগের এক ভাগ যদি তোমাদের সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি একটি সন্তান থাকে তবে যা রেখে যাও তার আট ভাগের এক ভাগ তারা পাবে, তোমাদের অসিয়তের দাবি বা ঋণ পরিশোধের পরে। আর যদি কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক সম্পত্তি রেখে যায় তার আছে এক ভাই বা এক বোন তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। —সুরা নিসা, ৪/৭, ১১, ১২

ইসলাম নারীকে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে কিছু আর্থিক সুবিধা দিলেও কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু। নারীকে এই সুবিধা দানের জন্যে অহংকারও কম নেই ইসলামের। কিন্তু ইসলামের আইনে নারী পিতা ও স্বামীর যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে তাতে তার অংশ খুবই কম, সব ক্ষেত্রেই তা পুরুষের অর্দ্ধেক। মুসলমানরা দাবি করেন নারী যেভাবে পিতৃকুল ও পতির কুলে সম্পত্তি পায় তা যোগ করলে পুরুষের অংশকে ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু তা সত্যি নয়। সব রকম হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেছে একই অবস্থানে নারী কোনও ভাবেই পুরুষের অংশ ছাড়িয়ে যায় না।

সুরা নিসায় কোরানের স্রষ্টা আবার পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন—

> পুরুষ নারীর রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এজন্য যে, পুরুষরা তাদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে।

—সুরা নিসা, ৪/৩৪

এই বিষয়ে সতর্কবাণীও রয়েছে আল্লাহর—

যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা কোরোনা। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য, আর নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য।

—সুরা নিসা, ৪/৩২

আল্লাহর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না নারী। এটা আল্লাহর বিধান। এই বিধান থেকেই গড়ে উঠেছে ইসলামের সব আইনকানুন যা নারীকে করেছে শৃঙ্খলিত। যা থেকে ইসলামের বিশ্ব নারীকে আর মুক্তি দেয়নি। মুসলমানরা বলেন ইসলাম নারীকে যত সম্মান দিয়েছে অন্য কেউ তা দেয়নি। এখানে কোথায় সেই সম্মান। কোথায় বা পরিপূর্ণ সামাজিক অধিকার। একজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলে অন্যজনের অধিকার সংকুচিত করে নিতে হয়। তার সমান অধিকারের দাবি তুলে নিতে হয়। কোরান নারীকে সেই কথাই শিখিয়েছে।

AMARBOI.COM

কোরান : ইসলাম ও বিবাহ

ইসলামে বিয়ে কোনও ঐশী ধর্মানুষ্ঠান নয়। বিয়ে একটা চুক্তি। রসকষহীন, কর্কশ। বলেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদরা। এই চুক্তি দুটি সমমানুষের মধ্যে নয়, অসম মানুষের মধ্যে, যেখানে একজনের শ্রেষ্ঠত্ব অপরের ওপরে আরোপিত। ইসলামে বিয়ে এক অসম চুক্তি। যাতে পুরুষটি ভোগ করে চুক্তিটির সুবিধা আর নারীটি ভোগ করে পীড়ন। এই আইনে স্ত্রী হয়ে ওঠে চুক্তিবদ্ধ দাসী। যে নিজেকে চুক্তি করে সমর্পণ করে একটি পুরুষের খেয়ালখুশির কাছে। বলেছেন হুমায়ুন আজাদ, বাংলাদেশের প্রয়াত লেখক ও গবেষক, তাঁর বিখ্যাত 'নারী' গ্রন্থে।

ইসলাম পুরুষকে করেছে বহুভোগ্যা। সুরা নিসার প্রথমেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন—

> তবে বিয়ে করবে (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার জনকে। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এভাবেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি।
>
> —সুরা নিসা, ৪/৩

ইসলাম এইভাবে পুরুষকে চারটি নারীকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখার বৈধ অধিকার দিয়ে দিয়েছে। অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করেন আরবের তখনকার সমাজব্যবস্থায় বহুপত্নীক ও বহুভোগ্যা পুরুষদের বহুবিবাহ এবং বহু নারীকে অবৈধভাবে ভোগ করার প্রবণতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত এবং বিবাহ-অনুষ্ঠানকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্যেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। এই আয়াতকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। মুসলমান পণ্ডিতরা মনে হয় তা ভেবে দেখেন না। তাঁরা আরো মনে করেন মুসলমান পুরুষদের চারটি বিয়ে করার অধিকার প্রদান নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন ছিল না। শর্ত ছিল সব স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে হবে। সুবিচার বলতে যদি সব পত্নীকে সমান খাওয়া-পরা দেওয়া বোঝায় তাহলে এই শর্ত পালন করতে না পারার কোনও কারণ ছিল না। পতি-পত্নীর দাম্পত্য জীবন তো শুধু অশন-বসনে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু তার বাইরে যদি নিয়ে যাওয়া হয় সেই 'সুবিচার'কে তাহলে কার্যত তা কোনও মানব-সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বের সর্বকালের 'শ্রেষ্ঠ মানব' যাঁকে বলা হয়, সেই রসুল মোহাম্মদও তা পারেননি। সে কথায় আমরা পরে আসছি। আল্লাহ নিজেও জানতেন তাঁর কোনও বান্দার পক্ষে তা সম্ভব নয়, তাই সুরা নিসার অন্য একটি আয়াতে তিনি বললেন—

> আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের সাথে কখনোই সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোনো-একজনের দিকে সম্পূর্ণ রূপে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলিয়ে রেখো না।
>
> —সুরা নিসা, ৪/১২৯

আল্লাহ শেষপর্যন্ত মুক্ত করে দিলেন তাঁর বান্দাকে। সমান ব্যবহার করতে না পারলেও তারা এরপর ৪টি বৈধ স্ত্রী একসাথে রাখতে পারে। আল্লাহ তো 'ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, উদার ও তত্ত্বজ্ঞানী"। তিনি মুসলিম পুরুষের জন্যে মাত্র এক অংশ স্ত্রী বরাদ্দ করে দিলেন।

AMARBOI.COM
আমার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ইসলামে বিবাহকে বলা হয়েছে আল্লাহর অশেষ নিয়ামত এবং তাঁর রসুলের সুন্নত। পুরুষ একসাথে চারটি বিয়ে করলেও সেই নিয়ামত কমে যায় না। বরঞ্চ সেই নিয়ামত বেড়ে যায়। রসুল মোহাম্মদ ও বহুপত্নীক ছিলেন। তাই বহু বিবাহ করা তাঁর সুন্নত। এটাই রসুলের উম্মতের জন্যে আদর্শ। সুন্নত হল রসুলের ঐতিহ্য। আর উম্মত হল তাঁর উত্তরাধিকার। এই যে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নির্দেশ দিলেন কোনও একজন স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে না পড়তে, সেটাও যে তাঁর বান্দা পালন করতে পারবেন না তা তিনি জানতেন। তাই এই সুরা। আল্লাহ সব জানেন, তিনি দয়ালুও ক্ষমাশীল। তিন অন্তর্যামী। এই সুরা কোনও সতর্কবাণী নয়—উপদেশ মাত্র।

ইসলামী বিবাহে পুরুষ সবসময় বিয়ের সময় নারীর কাছে 'ইজাব' (প্রস্তাব) পাঠাবে আর নারী তা 'কবুল' করবে। নারী বা ভাবী পত্নী ইজাব পাঠাবে আর পুরুষ বা ভাবী পতি তা কবুল করবে—এটা হতে পারে না কোনও ভাবেই। বিয়েতে নারীর সম্মতিপ্রদান বা 'কবুল' বলা যে কী তা আমরা দেখেছি ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে। নারীর বিয়েতে কবুল বলা বাস্তব অর্থে কোনও অর্থ বহন করে না। এই নিয়ে পরেও আমাদের আলোচনা আছে।

ইসলামে কোনও বৈরাগ্য নেই। পুরুষের জন্যে তা হারাম। নারীর তো কোনও স্বাধীন সত্ত্বাই নেই। নারীকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের অবাধ গমনের শস্যক্ষেত্র রূপেই। রসুলের একটি হাদীসে বলা হয়েছে "যখন কোনও ব্যক্তি বিয়ে করে তার অর্ধেক ইবাদত (প্রার্থনা) পূর্ণ হয়ে যায়। বাকী অর্ধেকের জন্য যেন সে আল্লাহকে ভয় করে।" অন্য একটি হাদীসে রয়েছে "বিয়ে করা আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত হতে বিরত থাকবে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নহে।" বিবাহ ইসলামের জীবনবিধানে এমন একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য যা না করলে রসুলের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তার সরল অর্থ সে ব্যক্তি আর মুসলমান থাকে না। বিবাহ সম্বন্ধে আর একটি হাদীস হল, "বিবাহিত পুরুষের এক রাকাত (নামাজের এক অংশ) নামাজ অবিবাহিত পুরুষের সত্তর রাকাত নামাজ হতেও উত্তম"। এই হাদীসে বিবাহ পেয়ে গেছে নামাজের মর্যাদা। তাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের সাথে। এর পর কোনও মুসলমান পুরুষ অবিবাহিত থাকার জীবন বেছে নিতে পারে। বিয়ে করা তার কাছে পূণ্য অর্জনের পথে পা বাড়ানো।

আগেই বলা হয়েছে ইসলামে বিয়ে একটি অসম চুক্তি। হুমায়ুন আজাদ ইসলামী বিয়ের চুক্তির ব্যাখ্যা নিয়ে আনোয়ার আহমদ কাদরির একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর 'নারী' গ্রন্থে (পৃ. ৭৬)। "ইহা এমন এক চুক্তি যাহার দ্বারা একজন পুরুষ কর্তৃক একজন নারীকে সম্ভোগের অধিকার দ্বারা দখল করা বুঝায়।" (মজিবর রহমান—'মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি')। হুমায়ুন আজাদ এর ওপর মন্তব্য করেছেন—"ইসলামী বিবাহ চুক্তির নৃশংসতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে এই ভাষ্যটিতে। বিয়েতে একটি পুরুষ 'দখল করে' একটি নারীকে। দখল করে 'সম্ভোগের অধিকার দ্বারা'। 'সম্ভোগ' ও 'দখল' দুটিই নৃশংস পশুর কাজ। এ চুক্তির অনন্ত সুফল উপভোগ করে পুরুষ। নারী হয় শিকার। ক্রীতদাসীও এমনভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে না প্রভুর কাছে, যেভাবে করে মুসলমান স্ত্রী।" হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য কঠোর মনে হতে পারে। কিন্তু দেশে দেশে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে আমরা তা দেখেছি।

ইসলামী বিবাহ প্রথায় 'দেনমোহর' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিয়ের চুক্তির ফলে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পায় দেনমোহর। কিছু অর্থ, অলংকার বা সম্পত্তির লিখিত প্রতিশ্রুতি। যার বিনিময়ে স্বামী নামে পুরুষটি লাভ করে স্ত্রী নামে নারীটির দেহের ওপর একচ্ছত্র অধিকার। তখন স্ত্রী পরিণত হয়ে যায় অনুগতা বৈধ যৌনদাসীতে। সেখানে যখন খুশী গমন করে কর্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যায়। দেহমোহর শুধু কাবিনে লেখা থাকে। স্ত্রী সাধারণত তা নগদে পায় না। এমন কী বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও তা সাধারণত আদায় হয় না। দেনমোহর পরিমাণে খুব বেশী হয় না। ইসলামের আইনী মজহাব হানাফী আইনে বলা হয়েছে দেন মোহর হবে কম পক্ষে ১০ দিরহাম। অন্য মজহাব মালিকি আইনে কমপক্ষে ৩ দিরহাম। আর হাদিস অনুসারে কমপক্ষে ১টি লোহার আংটি। রসুল মোহাম্মদ বলেছেন "নিশ্চয়ই এই ধরনের বিবাহে বরকত বেশী হয় যে বিবাহের মোহর কম থাকে"। তিনি আরও বলেছেন "ঐ স্ত্রীলোক অতি উত্তম যে দেখিতে সুন্দরী এবং যাহার মোহর অতি নগন্য।" হজরত মোহাম্মদ অসুন্দরী নারীদের পছন্দ করতেন না। বিয়েতে দেনমোহরের পরিমাণ নিয়ে কনে ও বরপক্ষের মধ্যে দরকষাকষি চলে দুই পক্ষের অভিভাবকের মধ্যে। এটা স্বীকৃত প্রথা। সেখানে কনের কোনও ভূমিকা থাকে না। কিন্তু তার শরীর নিয়েই চলে হাটের দরাদরি।

নারীদের দেনমোহর খুশি মনে দিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে কোরান। সেই সাথে স্ত্রীদেরও উপদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন খুশি মনে দেনমোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়।

> আর তোমরা নারীদেরকে তাদের দেনমোহর খুশি মনে দিয়ে দাও। যদি তারা খুশি মনে তার কিছু ছেড়ে দেয় তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করো। —সুরা নিসা, ৪/৪

কোরান পুরুষকে শুধু নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্তৃত্বই দান করেনি, অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার করার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছে।

> স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভাল করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেওনা ও তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খুঁজবে না। —সুরা নিসা, ৪/৩৪

কোরানে পুরুষ কোন কোন নারীকে বিয়ে করতে পারবে না তার তালিকা রয়েছে (সুরা নিসা, ৪/২২-২৩)। সেই তালিকায় উল্লিখিত সম্পর্ক ছাড়া সব নারীকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারেন শুধু সধবা (যার স্বামী বর্তমান) নারী ছাড়া (সুরা নিসা, ৪/২৪)। এই সধবা শুধু মুসলিম নারীদের বেলা প্রযোজ্য। কাফের বা অংশীবাদী নারী হলে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। অন্য একটি গ্রন্থে (কঙ্কর সিংহ—'ইসলাম ও পরধর্ম') এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা। পরধর্মের কোনও সধবা নারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা মুসলমানদের অধিকার ভুক্ত হয় যুদ্ধবন্দীরূপে বা অন্যভাবে, তাহলে তার পূর্ববর্তী বিবাহ বাতিল হয়ে যায় তিনি না চাইলেও। তার স্বামী তখন পরপুরুষ হয়ে যান তার কাছে, সেই সধবা নারী তখন আর সধবা থাকেন না ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে। তখন যে কোনও মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে। তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তাকে অধিকার করে নিয়ে। খুব সহজ আইন ইসলামের।

একজন মুসলমান পুরুষ চারটি বৈধ স্ত্রী রাখার পরও যত খুশী 'ডান হাতের অধিকারভুক্ত' দাসীকে সম্ভোগ করতে পারে, কোনও বাধা নেই ইসলামী আইনে বা নৈতিকতায়। দাসী সম্ভোগ ইসলামে বৈধ। ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদের বেলায় কোনও সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি কোরানে।

> আমি তোমার জন্য তোমাদের স্ত্রীদেরকে বৈধ করেছি যাদেরকে তুমি দেনমোহর দিয়েছ ও বৈধ করেছি তোমার ডানহাতের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে।
>
> —সুরা আহজাব, ৩৩/৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ব্যাপারে কোরানে আরও আয়াত আছে। মুসলমানদের অবাধ যৌন জীবন যাপনে কোরান ঢালাওভাবে অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম এখানে গ্রহণ করেছে আরবের উত্তরাধিকার। যাদের কাছে নারী ছিল শুধু ভোগ ও কামনার বস্তু। মরুচারী আরব চিরকাল এক নারী থেকে অন্য নারীতে ছুটেছে। কোনও একজন নারীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি। আরব্যরজনীর অসংখ্য উপাখ্যান মালায় সেসব কাহিনী ছড়িয়ে আছে, নতুন ধর্ম ইসলাম তাকে গ্রহণ করেছিল আদর্শরূপে।

বিয়ের প্রসঙ্গেই আসে তালাক। তালাক ইসলামের পরিভাষা যার সরল অর্থ বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা। ইসলামী বিয়ে একটি চুক্তি, কিন্তু অসম চুক্তি। হুমায়ুন আজাদের ভাষায়—

> ইসলামি আইনে বিয়ের চুক্তি মালিক-শ্রমিকের চুক্তির থেকেও ভয়াবহ ও শোষণমূলক, কেননা এখানে চুক্তি ক'রেই একজনকে দেয়া হয় অশেষ অধিকার এবং আরেকজনের প্রায় সমস্ত অধিকার বাতিল হয় কিছু সুযোসুবিধার বিনিময়ে। ইসলামি আইনে স্ত্রী হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ দাসী, যে স্বামীকে দেবে যৌনতৃপ্তি ও বৈধ সন্তান। কিন্তু স্বামী যখন ইচ্ছে মনের খেয়ালে শুধু তিনবার 'তালাক' ব'লে ছেড়ে দিতে পারবে তাকে। চুক্তির কথা বলা হ'লেও ইসলামি বিয়েতে পুরুষ ও নারীটি চুক্তিতে আসে না, চুক্তিতে আসে পুরুষ ও নারীর অভিভাবক। বিয়েতে নারীর সম্মতির কথাও বলা হয়, কিন্তু তা সম্মতির অভিনয়। (নারী—পৃ. ৭৬)
>
> ...ইসলামে বিয়ে যেহেতু চুক্তি, তাই তা চিরস্থায়ী নয়; যে-কোনো সময় স্বামী তা বাতিল করতে পারে। তালাক মুসলমান নারীর জীবনে সবচেয়ে ভয়ংকর শব্দ, ওই বজ্র যে-কোনো সময় নীলাকাশ থেকে তার মাথায় এসে ফাটতে পারে। মুসলমান পুরুষ চারটি বৈধ বিয়ে করতে পারে, পঞ্চম একটিও করতে পারে না। পঞ্চম বিয়ে করলে বিয়েটি বাতিল হয় না, শুধু দরকার পড়ে আগের একটি স্ত্রীকে এক-দুই-তিন ক'রে তালাক দেয়া। মুসলমান পুরুষের জন্যে তার চারটি স্ত্রী সম্ভোগই শুধু বৈধ নয়, সে তার ক্রীতদাসীদের সাথেও সঙ্গম করার অধিকারী। (নারী—পৃ. ৭৭)

কোরান তালাক সম্বন্ধে কী বলে আমরা দেখে নিতে পারি। সুরা বাকারায় আছে -

> আর যদি তারা তালাক দিতে সংকল্প করে তবে তো আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।
> তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে।
> এ তালাক দুবার, তারপর হয় ভালভাবে রাখবে বা সদয়ভাবে বিদায় দেবে।
>
> —সুরা বাকারা, ২/২২৭-২২৯

বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি কিংবা দেনমোহর ধার্য হয়নি তেমন স্ত্রীকে অবাধে তালাক দেওয়া যায়। যদি দেনমোহর ধার্য হয় তা হলে তার পরিমাণ হবে অর্দ্ধেক। তবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মাফ করে দিলে সেই দেনমোহরও দিতে হবে না।

> স্ত্রীকে স্পর্শ করার বা দেনমোহর ধার্য করার পূর্বে যদি তাদেরকে তালাক দাও, তবে কোনো পাপ হবে না, আর তোমরা যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, অথচ দেনমোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক - তা হলে নির্দিষ্ট দেনমোহরের অর্দ্ধেক তোমাদেরকে আদায় করতে হবে। —সুরা বাকারা, ২/২৩৬-২৩৭

তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ভরণপোষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে— তবে তা বাধ্যতামূলক নয়, তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মুসলমান পুরুষের সদিচ্ছা ও সামর্থের ওপর। নারী তালাক দিতে পারে এমন কথা কোরানে বলা নেই। কোরানের তফসিরকাররা এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করলেও একটা বিষয়ে বোধহয় ভিন্নমত নেই যে স্ত্রী শুধু তালাক চাইতে পারে যদি তার স্বামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামে প্রভৃতি তা অনুমোদন করে। সেক্ষেত্রে নারীকে তার দেনমোহরের দাবি পরিত্যাগ করতে হয়। স্বামীর কোনও রকম সম্পত্তির ওপরও তার অধিকার থাকে না।

ইসলামে বিয়ে নামে যে চুক্তি তা স্বেচ্ছাচারী স্বামী যে কোনও মুহূর্তে ভেঙ্গে দিতে পারে। "ইসলামে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাক গেলাশ থেকে জল ঢালা থেকেও সহজ স্বামীর জন্যে, আর স্ত্রীর জন্যে ফাঁসির রজ্জু খোলার থেকেও তা কঠিন।" অনেক পণ্ডিত প্রবর মনে করেন কোরানে এক সাথে তিন তালাক দেওয়ার বিধান নেই। দুই তালাক দেওয়ার পর ইচ্ছা করলে তালাক ফিরিয়ে নেওয়ার কথাও সেখানে রয়েছে। ৩য় তালাকের খড়্গ সেখানে ঝুলিয়ে রাখা হলেও পরে তা গ্রহণ করা হয়নি। ইসলামের শ্রেষ্ঠ খলিফা বলা হয় হজরত ওমরকে। তিনি কোরানকে অতিক্রম করেছেন একথা ভাবা যায় না। তিন তালাক নিয়ে কোরানের ভাষ্যকাররা যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন খলিফা ওমরের খেলাফতের কালে তাতে তিন তালাক একসাথে দিতে পারার বৈধতা পায়। সেই থেকে মুসলমান সমাজে তিন তালাক নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। ইসলামের ইতিহাস তাই বলে।

ইসলামের ইতিহাসে শুধু নয়, রসুল মোহাম্মদের কাছেও ওমরের স্থান ছিল তুলনাহীন। মোহাম্মদ আল্লাহর শেষ নবী। সেই তিনিও ওমর সম্বন্ধে বলেছেন,

আমার পর যদি কোনও নবী হত তাহলে ওমর ইবনে খাত্তাব সেই সৌভাগ্য লাভ করত। (তিরমিজি শরীফ)

ওমর সম্বন্ধে কী মহান মূল্যায়ন মোহাম্মদের। এই ওমরের খেলাফতেই তিন তালাক নিয়ে সব বিতর্কের অবসান হয়। কিন্তু ওমরের কথা বলা হলেও, ইসলামের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেরী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল—সকলেই একমত যে আলাদা আলাদা বা এক সাথে যেভাবেই তিন তালাক দেওয়া হোক, তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। খলিফা ওসমান ও খলিফা আলীও একসঙ্গে তিন তালাককে চূড়ান্ত বলে গণ্য করেছেন এবং সেভাবে ফতোয়া জারী করেছেন। রসুলের আমলেও একসাথে তিন তালাক দেওয়ার অনেক ঘটনা ঘটেছে। রোধ করা যায়নি। অসন্তোষ প্রকাশ করলেও তা মেনে নিয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তালাকপ্রদান কারীকে শাস্তি দেওয়ার কথা বললেও তালাক বাতিল করেননি।

(আলোচনা-বোখারী শরীফ, মাওলানা আজিজুল হক, পৃ. ২৮৪২-৪৩)

দেখা যায় ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক কাল থেকেই একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া বৈধতা পেয়েছিল। তারপর থেকে এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

কোরানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ইসলামের শরীয়া আইন। সেই আইনে একসাথে তিন তালাক দেওয়া বৈধ। তালাক সম্বন্ধে আরো কিছু কথা—

"তালাক (শব্দটা উচ্চারণ বা অন্য যে কোন ভাবে তিনবার একসাথে বা আলাদাভাবে প্রকাশ করা), লেয়ান (প্রমাণ করতে পারুক বা না-ই পারুক স্ত্রীর ওপর ব্যাভিচারের অপবাদ আনলেই বিয়ে ভেঙ্গে যায়), এই দুই পদ্ধতিতে স্বামী এক মিনিটেই বিয়ে বাতিল করতে পারে। আর যিহার (স্ত্রীর শরীরের কোন অংশের সাথে স্বামী তার মায়ের শরীরের ওই অংশের তুলনা করলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়—আরব বেদুঈনদের প্রাচীন সংস্কৃতি) এই তিন পদ্ধতিতে স্বামী এক তালাক দিতে পারে। শারিয়ায় তালাকের একচ্ছত্র অধিকার আছে শুধুমাত্র স্বামীর হাতে, স্ত্রীর হাতে নয়। পৃথিবীর কোন সংগঠন বা ব্যক্তির অধিকার নেই স্বামীকে তালাক থেকে বিরত রাখতে পারে বা তালাকের কারণ জিজ্ঞেস করত পারে। লেয়ান আর যিহার আজকাল আর দেখা যায় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তাৎক্ষণিক তালাকের বজ্র স্ত্রীদের মাথায় নেমে আসে মুসলিম সমাজে। আরও লক্ষনীয় যে দাসী-স্ত্রীদের বেলায় তিনবার নয়, তালাক হয়ে যায় দু'বারেই। এবং তালাকের পরে সাধারণ স্ত্রীরা তিন এবং দাসী-স্ত্রীরা দুই ইদ্দতের পরে বিয়ে করতে পারে।

লক্ষনীয় যে শারিয়া-আইনে মাদক বা মদের ঘোরে, অত্যাচারের চাপে, রাসায়নিক প্রভাবে, হাসিঠাট্টার ছলে বা চাপের মুখে তালাক উচ্চারণ করলেও তাৎক্ষণিক ভাবে তালাক পুরো হয়ে যায়। কারণ, স্বামী নাকি বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে "সর্বশ্রেষ্ঠ" সিদ্ধান্ত নেয় তালাক দেবার, যে অধিকার তাকে নাকি আল্লাই দিয়েছেন।"

ইসলামে তালাক দেওয়ার অধিকার শুধু স্বামীর। স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার কোরান অনুমোদিত নয়। সব ইসলামী পণ্ডিতরা এই ব্যাপারে একমত। স্বামী চাইলে যে কোনও শর্তের ওপর স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে যেমন কোনও স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি একাজ কর না, স্ত্রী যদি ভুলবশতও তা করে তাহলেও তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। কোনও স্বামী 'তুমি পিত্রালয়ে যাবে না' এই শর্ত জুড়ে দেয় তালাকের সাথে, স্ত্রী যদি এরপর অতি প্রয়োজেনও সেখানে যায় তাহলে তার তালাক হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে একটি ইসলামী উপদেশ তুলে ধরা যায়।

> কোনও এক স্ত্রী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় তার স্বামী বলে উঠল, তুমি উপরের দিকে উঠলে তালাক এবং নীচের দিকে নামলেও তালাক আর দাঁড়িয়ে থাকলেও তালাক। স্ত্রীলোকটি তক্ষুনি লাফিয়ে নীচে পড়ে গেল, আর বুদ্ধির জোরে তালাক হতে বেঁচে গেল।
>
> (মাকছুদুল মুমেনীন'—মাওলানা আবদুল মান্নান সুফি)

এরকম উপদেশমূলক নীতিগল্প অনেক পাওয়া যায় ইসলামী পুস্তকে। কোরান-হাদীসের মর্মবাণীকে ধারণ করেই যা সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে যে নারীকে বুদ্ধিমতি বলা হয়েছে, সে আসলে স্প্রীং দেওয়া একটি পুত্তলিকা। তাকে পুরুষের ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনও ভাবে ভাবা যায় না। এই হল বিবাহিত জীবনে নারীর প্রাপ্তি। আল্লাহর নিয়ামত।

মৃত স্বামী বা তালাক দেওয়া স্বামীর জন্যে নারীর ইদ্দত পালন বাধ্যতামূলক। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকে মাত্র তিনদিন অপেক্ষা করতে হয়, বেশী নয়। আর এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সাথে সাথে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা যায়, এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হয় না স্বামী নামে পুরুষটিকে।

যেখানেই তালাক সেখানেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করার প্রশ্নটা চলে আসে। কারণ অনেক সময় ভুলবশতও তালাক দেওয়া হয় স্ত্রীকে। কোরানে তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার বিধান রয়েছে,

> তারপর ঐ স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় তবে যে-পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। তারপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয় তবে তাদের মিলনে কোনো দোষ নেই। —সুরা বাকারা, ২/২৩০

বড় অদ্ভুত এই বিধান। কোনও পুরুষ যদি ভুল করে তালাক দিয়ে পরে তার স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে চায় তাকে সহজভাবে ফিরিয়েও নেওয়া যাবে না। তাকে আবার বিয়ে দিতে হবে দ্বিতীয় কোনও পুরুষের কাছে। সেই পুরুষের সাথে অবশ্যই সেই নারীর যৌন-সহবাস হতে হবে। শুধু একসাথে থাকা নয়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক রাতের স্বামী বলে কথিত সেই পুরুষের অঙ্ক-শায়িনী হতে হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নারীকে এখানে ধর্ষিত হতে হবে। ইসলামের পরিভাষায় এই ২য় পতিকে বলা হয় 'মুহাল্লিল'। তার এখানে পরিত্রাতার ভূমিকা, তিনি সেই নারীকে ভোগ না করলে তিনি পরিত্রান পাবেন না। উদ্ধারকারী ২য় পতি সেই মুহাল্লিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর করুণা করে ক্ষণকালের স্ত্রীকে যদি তালাক দেয় তবে যথাবিহিত ইদ্দত পালনের পর প্রথম পতির তালাক দেওয়া সেই নারী আবার তার কাছে ফিরে যেতে পারে। নচেৎ নয়। কোরানের তফসিরকাররা বলে থাকেন তালাককে নিরুৎসাহ করার জন্যেই এত কঠিন বিধি। কিন্তু যে পুরুষ ভুল করে তাকে তো কিছুই হারাতে হয় না, সব মূল্য দিতে হয় নারীকে। সুরা বাকারার এই আয়াত নারীর জন্যে যে চরম অসম্মানের তা ভেবে দেখেন না কোরান বিশেষজ্ঞরা। এই আয়াতের পক্ষে যত ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, নারীর শরীর নিয়ে এই যে কানামাছি খেলা তা এক নির্লজ্জ বিধি। অনেকে মনে করেন তালাকপ্রাপ্তা নারীর দ্বিতীয়বার যে বিয়ে তা শুধু নামের বিয়ে, কাজের নয়। শুধুই নিয়মরক্ষা। কিন্তু এই ব্যাপারে রসুল মোহম্মদ নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। রসুল বলে গেছেন মুহাল্লিলের সাথে বিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয় (Consummate) যতক্ষণ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে যৌন-মিলন ঘটে (বোখারী হাদিস—২০৭৮, ২০৭৯)। আসলে ইসলামে কোনও বিয়েই যৌন মিলন ছাড়া বৈধতা পায় না। যৌনতা ছাড়া মরুবাসী আরবরা যেন স্ত্রীর সাথে অন্য কোনও সম্পর্কের কথা ভাবতেই পারে না। আল্লাহর শেষ নবীও তার বাইরে যেতে পারেননি। সুরা বাকারার ২৩০ নং আয়াতের, তালাক এবং পুনর্বিবাহ নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ Al-Baydawi, Al-Suyuth Ibn Quyyim এবং Al-Jawjiyy'-র গ্রন্থে। হাদীসকার আল-বোখারীর সহীহ হাদীস শরীফেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে।

ইসলামের প্রথম যুগে আরও এক প্রকার বিবাহ-বিধি প্রচলিত ছিল। যাকে বলা হয়েছে চুক্তি বিবাহ। ইসলামের পরিভাষায় যার নাম মুতা বিবাহ। ইসলামের গরিষ্ঠ অংশ সুন্নীদের মধ্যে মুতা বিবাহ আর চালু না থাকলেও শিয়াদের মধ্যে এখনো এই বিবাহ প্রথা মান্যতা পায়।

"শিয়া মুসলিমদের একটি অংশ অস্থায়ী বিবাহকে আইনসঙ্গত মনে করেন।"

(সৈয়দ আমীর আলী— 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম')

মুতা বিবাহ এক অস্থায়ী চুক্তি। তা এক বিশেষ সময়ের জন্যে। তা একদিনের জন্যেও হতে পারে এই বিয়ে বা যৌনচুক্তি। এ বিয়ের চুক্তি শুধু বিশেষ সময়ের জন্যে নারীকে ভোগ করার অধিকার। শুধু তাকে একটি বৈধ ধর্মীয় লেবাস পরানো। না হলে এই চুক্তির সাথে পতিতা গমনের কোনও পার্থক্য নেই। আজকের সভ্য ভাষায় যাদের আমরা যৌন কর্মী বলি, মুতা বিয়ের স্ত্রী নামে সেই নারীকে যৌন কর্মীর বেশী মর্যাদা দেওয়া হয় না।

মুতা বিয়ে (Temporary Contractual Marriage) কীভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে চালু ছিল এবং রসুল মোহাম্মদ যে এই বিয়ে অনুমোদন করেছিলেন তা আমরা তুলে ধরছি। দেখা যাক বিশিষ্ট ইসলামী বিশেষজ্ঞরা কী বলেন—

> Muhammad made it lawful for his followers at first, then prohibited it! Then he made it legal again! Therefore, as soon as he died, the most famous Muslim scholars and relatives of Muhammad (such as Abdulla Ibn-Abbas and Ibn Mas'ud) made it lawful. It was also in practice during the era of Abu Bakr and Umar, as is recorded in Sahih Muslim.
>
> At present, the Shi'ite sects are accustomed to it and practice it in different parts of the world because the Shi'ite leaders claim it. There

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

are more than one hundred million Shi'ites worldwide. IbnAbbas,who defends the legality of the temporary marriage of enjoyment and its continued practice, is well known among all the Muslim scholars. He occupied a very esteemed position with Muhammad and the caliphs who used to seek his legal opinion and call him the interpreter of the Qur'an.

Sahih al-'Bukhari'—

While we were in the army, Allah's Apostle came to us and said, 'You have been allowed to have pleasure (Muta), so do it.' If a man and a woman agree to marry temporarily, their marriage should last for three nights, and if they want to continue, they may do so."

There is also a very famous story related to us by Ibn Mas'ud and recorded in all the Islamic sources. We will allude to some aspect of it as it as mentioned in al-Bukhari, Ibn Mass'ud said.

"We used to participate in holy battles led by Allah's Apostle and we had no wives with as. At that time, he allowed us to marry women with a temporary contract and recited to us this verse, 'Oh you who believe, make not unlawful the good things which Allah (God) has made lawful for you" (5:87).

Sahih Muslim

It was proven that contractual marriage was permissible at the beginning of Islam. It used to be practiced during a journey or a raid, or when it was "necessary" and there was a lack of women. In one of Ibn Abu'Umar's episodes, it said that it was admissible at the inception of Islam, especially when "there was a need for it".

আমরা আরও দেখে নিতে পারি,

"The contractual marriage was lawful before the campaign of Khaybar, then it became unlawful in the day of the campaign. Then it was made lawful again in the day of Mecca's conquest. After three days, it was prohibited. The episodes concerning the lawfulness (of the contractual marrage) in the day of the conquest are not ambiguous and it is not permissible to forfeit it. There is nothing that may inhibit the repetition of practicing the contractual marriage again, and God is the omniscient, and the scholars have agreed to regard the contractual marriage as a temporary legal marriage, which does not entail any inheritance. The spearation occurs as soon as the date of the agreement expires, and it does not require any legal divorce. Ibn' Abbas used to prech its lawfulness" (pp. 553, 554 volume 3 Sahih Moslem).

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Ismail Ibn Kathir—

In his famous book, "The Prophetic Biography", he tells us the following in part 3:

"The prohibition of the contractual marriage took place in the day of the Khaybar campaign. Yet it had been established in Sahih of Muslim that Muhammad allowed them again to (sign) a contractual marriage in the Day of Mecca's conquest. Then he prohibited it. The Shafi'i said : 'I do not know any other thing which was made lawful, then prohibited, then made lawful again. then unlawful except the contractual marriage, which was prohibited in the year in which Mecca was conquered, then after that it became lawful'"

Ibn Hisham recorded the same text.

Ibn Qayyim al-Jawziyya—

Ibn Qayyim al-Jawziyya repeated this same statement of al-Shafi'i. He also said.

"After the death of Muhammad, Ibn' Abbas made it lawful when there was a need for it. He used to say that the apostle prohibited it when it was dispensable. but it was made lawful when it became a necessity."

"Ibn Mas'ud said : 'I made it lawful when it became indispensable for a man."'

Imam al-Baydawi—

He agrees with all the above in his famous book, "The Interpretation of the Baydawi". He says,

"The purpose of the contractual marriage is the mere pleasure of intercourse with a woman, and her own enjoyment in what she has given"

মুতা-বিয়া সম্বন্ধে আমরা যাঁদের মতামত তুলে ধরলাম তাঁরা হলেন Ibn Abbas, Ibn Masu'd, Sahih-al Bukhari, Sahih Muslim. Ibn Hisham. Ibn Quyyim-al Jawziyya এবং al-Iman al-Baydayi, মুসলিম বিশ্বে এঁরা পূজনীয় চিন্তাবিদ ও দার্শনিক।

মুসলমানরা যেন নারী ছাড়া যুদ্ধেও যেতে পারেন না। রসুল হজরত মোহাম্মদের জীবনকালে মুসলমানদের জন্যে সব যুদ্ধই তো ছিল জেহাদ। নবধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সেই জেহাদেও নারীর শরীর প্রয়োজন হত মুসলিম যোদ্ধাদের। যারা যুদ্ধে জীবন দান করতেন তারা পেতেন শহীদের মর্যদা, আর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে পেতেন গাজীর সম্মান। যুদ্ধের সময় তাদের কোনওরূপ যৌন-সংযমের শিক্ষা দিতে চাননি আল্লাহর রসুল। যুদ্ধে সৈনিকদের পক্ষে পত্নী বা উপপত্নীকে সংগে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। মোহাম্মদ কিন্তু তাঁর পত্নীদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এটাই ছিল রেওয়াজ। তাঁর অনেক পত্নীদের মধ্য হতে লটারীর মাধ্যমে একজনকে নির্বাচিত করা হত যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে। রসুল স্ত্রীর সঙ্গ পেতেন, অন্যরা পেতেননা যুদ্ধ ক্ষেত্রে। সেইজন্যেই কী মুতা-বিবাহকে হালাল করে দিয়েছিলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনার মুখে বন্ধ করে দিয়ে পরে আবার অনুমোদন করেন। তাই কী মুতা-বিবাহ নিয়ে এই দোলাচল? এর উত্তর আমাদের জানা নেই। মুতা-বিবাহ হত 'স্বাধীনা' নারীর সাথে। সেখানে যৌনসম্ভোগকে বৈধতা দেওয়ার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী হলে যে সব নারী যুদ্ধবন্দী হত, তাদের সাথে মুতা বিবাহও প্রয়োজন হত না যৌন-সংগমের জন্যে।

একটি হাদীসে রয়েছে—

> হজরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন: আমরা রসূলুল্লহর সাথে বনি মুস্তালিক যুদ্ধে বাহির হইলাম এবং তথায় আমরা বহু যুদ্ধবন্দী লাভ করিলাম। এ সময় আমাদের নারী সঙ্গমের আকাঙ্খা জাগিল এবং নারীবিহীন থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল কিন্তু আমরা (যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে) 'আজল' করাকেই পছন্দ করিলাম;...আমরা তাঁহাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন: না করিলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি হইবে না।

নারীর কী চূড়ান্ত অসম্মান মুতা বিবাহে বা এই হাদীসে। ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে ঘরের বধূ রূপে কিছুটা। কিন্তু পরনারীকে একেবারেই কিছু দেয়নি। মুতা বিয়েকে বিয়ে বলাটাই ভুল। কিছু অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে নারীর দেহকে ভোগ করার মধ্যে পতিতা-উপভোগের পার্থক্য কতটুকু? পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজে পতিতাবৃত্তি ছিল এখনো আছে। তাদের যৌন-কর্মী বলা হলেও তারা কোন অর্থেই কর্মীর মর্যাদা পায়নি। পুরুষ তাদের দিতে চায়নি সে অধিকার। পুরুষের প্রয়োজনেই যৌন-কর্মীর সৃষ্টি। সে জগৎটা আলাদা। তারাও মনে করে। তাদের খদ্দেররাও মনে করে। কিন্তু বিয়ে নামে একটা মিথ্যা সম্মান কেন লাগানো হল মুতা-বিবাহে তা নিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদরাও ভেবেছেন অনেক। ইসলাম কখনো মুসলমানদের যৌন সংযমের কোনও শিক্ষা-দিতে পারেনি। তাই তার জন্যে কোনও নির্দেশ নেই। তাই মুসলমান সৈনিক সংযমী নয় রণাঙ্গণেও। সব জায়গাতেই মূল্য দিতে হয়েছে নারীকে। তারপরেও ইসলামে নারীকে বলা হয় 'ফিৎনা''। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। যার কাম এলোমেলো করে দিতে সমাজ-সংসার।

এই নারীর সম্মান ইসলামে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগ : নারী ও অবরোধ

আরব দেশে ইসলামের জন্ম। তার জন্মদিন ধরা যায় হজরত মোহাম্মদের নবুয়ত লাভের দিন। যেদিন বেহেশত্ থেকে ফেরেশতা জিবরাইল পরম করুণাময় আল্লাহর নির্দেশে মোহাম্মদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল ওহী। অবতীর্ণ হয়েছিল সুরা আলাক। আরবের ইসলামপূর্ব যুগকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ। এই নামকরণ ইসলামী ঐতিহাসিকদের। সত্যি কী সেই কাল অন্ধকার যুগ ছিল। আধুনিক ইতিহাস-গবেষকরা কিন্তু তা বলেন না। ইসলামকে গৌরবান্বিত করার জন্যে ক্রমাগত প্রচার করা হয়েছিল যে ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ইসলাম তাদের উদ্ধার করেছে। নবী মোহাম্মদ তাদের গৌরবের জীবন দান করেছেন। এটা ছিল ইসলামী আরবের ইসলাম পূর্ব অবস্থা সম্বন্ধে অপপ্রচার। ইতিহাসের এবং সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সত্যি নয়। সেই সময়কার আরবদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে নিন্দা তা হল তারা জন্মের পর নবজাত কন্যাশিশু হত্যা করত। তাদের জীবন্ত কবর পর্যন্ত দিত। এর পেছনে তখনকার আরব সমাজে যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ছিল তা ইসলামের ইতিহাস রচয়িতারা বিচার করে দেখেন নি। তাদের সেই বিচারবুদ্ধিও মনে হয় ছিল না। কন্যাশিশু হত্যা করার বর্বর প্রথা সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ নেই। মক্কার কোরাইশ বংশের মধ্যে কিছু পরিমাণে থাকতে পারে তাদের গোত্র-কৌলিন্য গর্বের জন্যে। সেই কুপ্রথাও এই গোত্রে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল একথা ভাবলে ভুল হবে। তাহলে তাদের মধ্যে কন্যাসংকট দেখা দিত। কোনও সমাজই সব কন্যাশিশুকে হত্যা করতে পারে না। প্রকৃতি নিজস্ব নিয়মেই সব সমাজে নারী-পুরুষের অনুপাতের একটা ভারসাম্য বজায় রাখে। এই ভারসাম্যের অভাব হলে সেই সমাজ টিকে না। পুরুষদের নারী জোটে না বিয়ের জন্যে। জন্মলাভ করে না পরবর্তী প্রজন্ম। লুপ্ত হয়ে যাই সেই সমাজ, গোত্র বা বংশ। আরব দুনিয়ার পুরুষরা নিন্দিত ছিল অত্যধিক নারী সংসর্গের জন্যে। এত নারী আসত কোথা থেকে যদি কন্যাই বেঁচে না থাকত। এত এত কন্যাশিশুকে যদি হত্যাই করা হত তাহলে পরে জননী হত কারা। কোন নারীরা গর্ভে ধারণ করত শুধু পুত্রশিশু। ইসলামের ইতিহাসবিদরা একটা ব্যাখ্যা অবশ্য দেন। ক্রমাগত গোষ্ঠী ও গোত্র সংঘর্ষের ফলে অনেক পুরুষ মারা যেত বলেই নারীর প্রাচুর্য দেখা দিত। আরবের বিভিন্ন গোত্রের বিশেষ করে কোরাইশ বংশের প্রধান পুরুষদের বংশলতিকা বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে একথার কোনও ভিত্তি নেই, আরবের কোন গোত্রেই কখনো নারী-পুরুষের অনুপাত ভারসাম্য হারায়নি। বরঞ্চ নারীর দিকে পাল্লাটা ছিল ভারী। ইসলাম পূর্ব কালে কোরাইশ বংশেও একই অবস্থা ছিল। এই বংশের পিতামহী, মাতা-কন্যা, জায়া-বধূরা বেঁচে ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। রসুল মোহাম্মদের বংশে সকলেই বহুপত্নীক ছিলেন। সেটাই ছিল আরবীয় প্রথা। বিয়ের জন্যে কন্যা সংগ্রহের জন্যে তারা দেশ-দেশান্তরে ছুটে গেছেন এমন উদাহরণও নেই। এসব ইতিহাস লেখা হয়নি। কোরাইশরা বহুকাল আরব-জগতে কোনও ব্যতিক্রম ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

না। ইসলাম পূর্ব আরবে যদি তেমনভাবে কন্যা শিশু হত্যা করা হত তাহলে আরব জাতি বিলুপ্ত হয়ে যেত। ইসলাম আরবে নারীকে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে তুলে এনে জীবনের আলোকে দাঁড় করিয়েছে—এই ভাবনাটা ভুল।

রসুল মোহাম্মদের জননী ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তাঁর প্রথমা পত্নী বিবি খাদিজা সম্বন্ধে কিছু তো জানা যায়। ইসলামপূর্ব আরবেও খাদিজার মত সম্ভ্রান্ত ও ধনবতী নারীর অস্তিত্ব ছিল। আরবের তৎকালীন সমাজে খাদিজা ব্যতিক্রমী নারী ছিলেন, একথাটা আমরা ভাবতে চাই না। আরো অনেক খাদিজারা ছিলেন। ইসলামের সাথে উঠে এসেছেন খাদিজা। অন্যদের ইসলামের ইতিহাস ধরে রাখেনি। খাদিজার সম্পদের উৎস কোথায় ছিল আমরা তা জানতে পারিনি। তিনি ছিলেন বিধবা। যদি পিতৃকুল এবং পতির কুল থেকে সম্পদ না পেয়ে থাকেন উত্তরাধিকার সূত্রে তা হলে তাঁর পক্ষে এত ধনবতী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। এটা বুঝতে ইসলামের ইতিহাস তোলপাড় করতে হয় না। খাদিজা ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি নিজে সেই ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তাঁর অনেক পুরুষ কর্মচারী ছিল। তার মধ্যে হজরত মোহাম্মদও ছিলেন একজন। এই ইতিহাস লুকানো যায়নি।

আরব নারীরা অবরোধবাসিনী ছিলেন না। ইসলাম তাদের মুক্ত পৃথিবী থেকে অবরোধে ঢুকিয়েছে। ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে নারীদের যে অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল, ইসলাম তা হরণ করে। নবীপত্নীদের দিয়ে তার সূচনা।

> হে নবিপত্নীগণ! তোমরা তো অন্য নারীদের মতো নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে কথা বলবে না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা ভালভাবে কথাবার্তা বলবে। আর তোমরা ঘরে থাকবে, জাহেলিয়া (প্রাগ্ইসলামি) যুগের মতো নিজেদেরকে দেখিয়ে বেড়িয়ো না।
>
> —সুরা আহজাব, ৩৩/৩২-৩৩

পত্নীদের অবরোধবাসিনী করতে চেয়েছিলেন রসুল মোহাম্মদ। আল্লাহর অনুমোদন তিনি পেয়েছিলেন। তিনি যা কামনা করেন আল্লাহ তা দান করেন। আল্লাহ তো অন্তর্যামী। সুরা আহজাব মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। নবীপত্নীদের জন্যে সাবধানবাণীও রয়েছে এই সুরায়।

> হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করে দিই আর তোমাদেরকে ভদ্রতার সাথে বিদায় দিই।
>
> হে নবিপত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। —সুরা আজহাব, ৩৩/২৮, ৩০

নবীর পত্নীদের চিরতরে বিদায় করে দেওয়ার এই যে সাবধানবাণী তা কি শুধু তাঁরা ভোগ বিলাসিতা কামনা করেছিলেন বলে না অন্য কিছু তা নিয়ে মতান্তর কম নয় কোরানের তফসিরকারদের মধ্যে। বিবি খাদিজা ততদিনে লোকান্তরিতা। হজরত মোহাম্মদ তাঁর মৃত্যুর পর বহুপত্নীপরিবৃত। তাঁরা প্রথমদিকে অবরোধবাধিনী ছিলেন না, প্রকাশ্যেই চলাফেরা করতেন। হজরত ওমর চাননি নবীপত্নীরা ওভাবে প্রকাশ্যে আসুন। হাদীসে তার উল্লেখ রয়েছে। এই আয়াতের প্রয়োজন ছিল তাঁদের অবরোধ বাসে নেওয়ার জন্যে। নবীপত্নী ছাড়া অন্যদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিল সুরা নূরের এই আয়াত।

> বিশ্বাসী নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন অঙ্গকে হেফাজত করে। যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (বা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> অলংকার) প্রদর্শন না করে। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। তারা যেন নিজের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মেয়েছেলে, তাদের অধিকার ভুক্ত দাস-দাসী, যৌনকামনারিক্ত পুরুষ আর সেইসব ছেলে যাদের নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়নি তাদের ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য (বা অলংকার) প্রকাশের জন্য সজোরে পা ফেলে না চলে। —সুরা নূর, ২৪/৩১

এখানে 'বিশ্বাসী নারী'দের প্রতি সরাসরি অবরোধের কথা বলা না হলেও এই আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ খুব গভীর, এখানে কোন্ কোন্ পুরুষের সামনে নারী যেতে পাববে না তা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে! নারী এখানে শুধু পরাধীনই নয় শৃঙ্খলিতাও, সেই শৃঙ্খল যে ইসলাম-পূর্ব নারীদের ছিল না এই আয়াত তা স্পষ্ট করে দেয়। সুরা নূর ও মদীনায় অবতীর্ণ। ততদিনে ইসলাম তার শক্তি সংহত করে নিতে পেরেছে।

যে অবরোধ ছিল প্রথমে শুধুমাত্র রসুল পত্নীদের জন্যে প্রযোজ্য তা কেন ইসলামে আশ্রিতা সব রমণীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হল তা নিয়ে ইসলামী বিশ্ব এখনো বিতর্ক করে চলেছে। অবরোধ এখন মুসলিম নারীর কাছে শৃঙ্খল। মনে হয় তার চেয়েও বেশী।

ফাতিমা মেরনিসনি নামে এক মুসলিম নারী ঐতিহাসিক তাঁর 'বোরখা পেরিয়ে' (Beyond the Veil) গ্রন্থে দেখিয়েছেন—

> ইসলামে কামকে দেখা হয় এক আদিম শক্তিরূপে, যা শুভও নয় অশুভও নয়। তার শুভাশুভ নির্ভর করে ব্যবহারের ওপর। ইসলামে মনে করা হয় যে নারী পুরুষের মধ্যে নারীর কামই প্রচণ্ড, তাই তা দারুণ সামাজিক উদ্বেগের ব্যাপার। নারীর ওই কামকে যদি বশে রাখা না হয়, তবে তা সৃষ্টি করবে *ফিৎনা* বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা, যা নষ্ট ক'রে দেবে সমাজকে। ইসলাম মনে করে নারীর পক্ষে নিজের কামকে বশে রাখা সম্ভব নয়, কেননা নারীর সে-চারিত্রিক শক্তি নেই; কিন্তু পুরুষের আছে, কেননা পুরুষ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে নারীর থেকে উৎকৃষ্ট। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ পেয়েছে নারীর ওপর প্রভুত্বের ও নারীকে রক্ষার অধিকার। নারীকে যে বোরখায় মুড়ে বা অবরোধে আটকে রাখা হয়, তা সমাজকে নারীর অনিবার কামের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্যে। (হুমায়ুন আজাদের 'নারী' গ্রন্থে উদ্ধৃত)

অন্য একটি গ্রন্থে তিনি বলেছেন ['মুসলমানের অবচেতনায় নারী' (Women in the Muslim Unconscious)]— "ইসলামে নারী হচ্ছে বিকলাঙ্গ প্রাণী।"

পুরুষের যদি চারিত্রিক শক্তি থেকে থাকে তাহলে তিনি নারী থেকে নারীতে ছুটতে পারেন না। আরব পুরুষ সম্ভোগপরায়ণ। সেটাই হল মুসলিম পুরুষের উত্তরাধিকার। তাকে সংযত করতেই কোরানে এত সুরা, এত আয়াত। পুরুষকে সংযত না করে নারীকে অবরোধে আবদ্ধ করেছে ইসলাম, নারীকে যোগ্য মূল্য দিতে পারেনি ইসলাম।

আমার বান্ধবী প্রভু বোরখা পড়ে না, মোরে কয়
যাঁরা পরহেজগার তারা কভু নারীর শরীর
কু-নজরে নয়, দেখে আল্লার শরিফ নয়নে;
লুচ্চা ও লম্পট যারা তারাই কেবলি বোরখার
অজুহাত তোলে। আল্লা দিক্ কালো কাপড়ের
পট্টি বেঁধে এইসব পুরুষের নাপাক নজরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার কি মত? দেখো, বসে আছে দর্জি আর তাঁতী
তারাও সমানভাবে তোমার মতের উদগ্রীব
তাদের ব্যবসা ধান্দা, তারা আছে কাঁচি ও কাপড়ে
সেলাই মেশিনগুলো ফোঁড় দেবে তোমার নির্দেশে।

(ফরহাদ মজহার, 'বোরখা', এবাদতনামা : ৩৫)

আল্লাহ কখনো মুসলমান পুরুষের নজরে কালো কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিতে পারেননি। পারবেন না। আল্লাহ নিজেও তো পুরুষ। পিতৃতন্ত্রের বিধাতা। ইসলামে এই বিধাতাপুরুষ নারীকে অনেক অধিকার দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তা সত্যি নয়।

ইসলামের আগে নারীর অবস্থা যতটা খারাপ ছিল বলে প্রচার করা হয় ততটা খারাপ ছিল না নারীর অবস্থা। সেটাই বাস্তব। নারী অনেক বেশী স্বাধীন ছিল ইসলাম পূর্ব আরবে।

রসুলের শাসনকালে মদীনায় 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পর, খোলাফারে রাশেদীনের কালে আমরা আর কোনও স্বাধীন নারীকে খুঁজে পাইনি। আর কোনও খাদিজা আবির্ভূতা হননি ইসলামের সেই স্বর্ণযুগে, তাদের আর উঠতে দেওয়া হয়নি। খাদিজারা হারিয়ে গেছেন যেন ইসলামের ইতিহাস থেকে।

শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নয় আরব নারীর ভূমিকা দ্বিল রণাঙ্গনেও। তারা সৈন্য পরিচালনা করতেন স্বাধীনভাবে। অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশ নিতেন। ওহোদ যুদ্ধে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিলেন। হিন্দা ইতিহাসে নন্দিতা হলেও তাঁর বীরত্বের কথা অনেক হাদীসেই উল্লেখ করা হয়েছে। অস্বীকার করা যায় না। প্রাক ইসলামী যুগে আরব নারীরা যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বীরত্বের পথে তাদের অনুপ্রাণিত করতেন। অশ্বারোহী সৈন্যরা ভগ্নি, স্ত্রী বা তাদের প্রেমিকার গান গাইতে গাইতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত। তাদের ভালবাসার পুরস্কার ছিল তাদের পরাক্রমের সর্বোচ্চ মূল্য। (সৈয়দ আমীর আলী—দ্য স্পিরিট অব ইসলাম)।

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে নারীরা সংগীত চর্চা করতেন। তাদের খ্যাতি ছিল। সে জন্যেই কী ইসলামে নারীদের কলা-সংস্কৃতি ও সঙ্গীত সাধনা একরকম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। 'অন্ধকার যুগে'র নারীদের সংগীত প্রতিভার কথা এখন ইসলামের ইতিহাসবিদরাও স্বীকার করেন।

অনেক নামী মহিলা কবি ছিল তখন আরবে। তাদেরও খ্যাতি ছিল। অস্বীকার করাও যেত না তাদের। নবীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করার অপরাধে ইহুদী কবি, বনি গোত্রের আসমা বিনতে মারোয়ান নামে এক নারীকে হত্যা করেন জনৈক মুসলমান। এই হত্যাকাণ্ড রসুল অনুমোদন করেছিলেন এবং খুশী হয়েছিলেন। কবি আসমা বিনতে মারোয়ানের সামাজিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ না হলে তাঁকে হত্যা করা হত না।

ইসলাম কবির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। কবি ও কবিতার সাথে যেন ইসলামের জন্মবিরোধ। এই সেই সাবধান বাণী,

এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত। —সূরা শোআরা, ২৬/২২৪

হাদীসে আছে—

কাহারও অভ্যন্তর কবিতায় পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা পুঁজে পরিপূর্ণ হওয়া উত্তম।

— বোখারী শরীফ, ২৩৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বশক্তিমান আল্লাহ : পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, পরম দয়াময়। তিনি বিচারদিনের মালিক (সুরা ফাতিহা, ১/১-৩)। কিন্তু আল্লাহ পুরুষ। পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। উজ্জ্বল তাঁর প্রতিষ্ঠা। তিনি নারী ও পুরুষের যুগ্ম অস্তিত্ব নন। সেজন্যেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব পুরুষতন্ত্রের প্রতি। আল্লাহ যে পুরুষ সে কথা তিনি ঘোষণা করেছেন কোরানে। কোনও দ্বিধা নেই তাতে। সুরা আনআমে বলা হয়েছে,

> তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কেমন করে? তাঁর তো কোনো স্ত্রী নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। —সুরা আনআম, ৬/১০১

মক্কায় অবতীর্ণ হয় এই সুরা। ইসলামের ঊষাকালে। আল্লাহ প্রথম থেকেই নিজেকে প্রভুরূপে ঘোষণা করেছেন। তাঁর কোনও স্ত্রী নেই। তাই সন্তানও নেই। স্ত্রী না থাকলে সন্তান আসবে কোথা থেকে? তবুও তিনি মানব-মানবীর স্রষ্টা , তবে পিতা নন, প্রতিপালক প্রভু। মানুষ তাঁর দাস। আজ্ঞাবহ। আল্লাহ যে সন্তান গ্রহণ করেননি সে কথা বার বার বলেছেন। সুরা মুমিনুনে বলেছেন,

> আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। --সুরা মুমিনুন, ২৩/৯১

একই কথা আল্লাহ আবার বলেছেন সুরা ফুরকানে,

> আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। —সুরা ফুরকান, ২৫/২

এই দুটি সুরাও মক্কায় অবতীর্ণ।

আল্লাহ যে কোনও সন্তান গ্রহণ করেননি, এ কথা আবার তাঁকে ঘোষণা করতে হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ অন্য একটি সুরায়।

> আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। —সুরা জুমার, ৩৯/৪

মক্কায় অবতীর্ণ অন্য একটি সুরায় রয়েছে,

> আর আমরা এ-ও বিশ্বাস করেছি যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অনেক ওপরে। তিনি কোনো স্ত্রী নেননি ও তাঁর কোনো সন্তানও নেই। —সুরা জিন, ৭২/৩

এই আয়াতে সন্তানের সাথে আবার স্ত্রীর কথাও এসেছে। কোরানের একেবারে শেষদিকে সংকলিত সুরা ইখলাস। এই সুরাও মক্কায় অবতীর্ণ। যে সুরায় আবার তিনি ঘোষণা করলেন তিনি কারও জাত নন। তাঁর কোনও জাতক নেই।

> তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। —সুরা ইখলাস, ১১২/৩

সংকলিত কোরানে এইসব সুরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হলেও সব সুরাই হজরত মোহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল যখন তিনি মক্কায় ছিলেন, মদীনায় হিজরত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি। মক্কাতেই মোহাম্মদ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁকে পুরুষতন্ত্রের প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মক্কায় অবতীর্ণ এইসব আয়াত আমাদের সে কথা মনে করিয়ে দেয়। ইসলামের ঊষাকালে নারীর যে স্বাধীনতা ছিল মক্কায় অবস্থান কালে মদীনায় যাওয়ার পর সে স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। ইসলামের বিজয় ইতিহাস যত এগিয়েছে পুরুষরা পদানত করেছে নারীকে। বন্দী করেছে তাদের হারেমে। নারী হয়ে উঠেছে একান্তভাবেই পুরুষের কামনার বস্তু। হয়ে উঠেছে ফিৎনা—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। নারীর স্বাধীন অস্তিত্ব অস্বীকার করেই ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। নারীকে তারা বহন করেছে সাথে, উপভোগের জন্যে। পুত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যে, সহধর্মিনী রূপে নয়। সহযোদ্ধা রূপেও নয়।

এই ইসলামের ইতিহাস।

AMARBOI.COM

মানুষের সৃষ্টিরহস্য

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। সেই মানুষ আদি মানব আদম। তারপর সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী বিবি হাওয়াকে, আদমের বক্ষপিঞ্জর হতে। আল্লাহ সে কথা ঘোষণাও করেছেন কোরানে বারবার। আল্লাহর যেহেতু কোনও স্ত্রী নেই তাই তাঁর কোনও সন্তানও নেই। আদম সন্তান নন আল্লাহর। আদমের প্রভু আল্লাহ। মানুষের আদিপিতা আদমের কোনও জনক নেই। জননীও নেই। প্রভু হলেও আল্লাহ আদমের পিতা-মাতা দুইই। সৃষ্টির আদিমাতার আবার দুজন স্রষ্টা। আল্লাহ ও আদম। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে বিবি হাওয়া সৃষ্ট হতেন না। আবার আদমের শরীর না হলেও তাঁর জন্ম হত না। আদমের দেহ হতে সম্ভূতা বলে তাঁকে আমরা আদম-দুহিতাও বলতে পারি।

মানবকে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে। সে কী আর্দ্র মৃত্তিকা! না তা নয়। আল্লাহ নরম মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী করেননি। তিনি মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছেন কখনো এঁটেল মাটি হতে, কখনো পোড়া বা শুকনো মাটি হতে জন্ম নিয়েছে মানব। কখনো শুধু মাটির কথাও বলা হয়েছে। কোরানের ভাষ্যকারদের কাছে হয়তো সব রকমের মাটি এক রূপেই দেখা দেয়। আল্লাহর ওহীর সংকলন কোরান। রসুল মোহাম্মদের ওপর তা অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরানে আদি মানবের জন্মের সপক্ষে যে সব আয়াত রয়েছে তা ধারাবাহিক ভাবে আমরা সাজিয়ে দিলাম।

তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। —সুরা আনআম, ৬/২

আমি তো ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি।
—সুরা হিজর, ২৫/২৬

তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। —সুরা রুম, ৩০/২০

ওদেরকে আমি এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি —সুরা সাফফাত, ৩৭/১১

আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি। —সুরা শা'দ, ৩৮/৭১

মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।
—সুরা রহমান, ৫৫/১৪

কোরানে মাটি ও শুক্রবিন্দু মিশিয়ে মানুষ সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে। মাটি ও শুক্রের সাথে আল্লাহর সৃষ্টিরহস্যে রক্তপিণ্ডও মিশে গেছে কখনো কখনো।

আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে,
তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে। —সুরা হজ, ২২/৫

আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি।
তারপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ আঁধারে রাখি, পরে আমি শুক্রকে করি জমাট রক্ত। —সুরা মুমিনুন, ২৩/১২-১৪

আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে।
—সুরা ফাতির, ৩৫/১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে। —সুরা মুমিন, ৪০/৬৭

মাটি নয়, স্খলিত শুক্র ও বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টির কথাও অনেকবার বলা হয়েছে কোরানে। কখনো আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করলেন শুধু তরল পদার্থ, পানি ও স্খলিত পানি থেকে। এই তরল পদার্থ বা স্খলিত পানিকে আমরা শুক্ররূপে ধরতে পারি।

তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। —সুরা নাহল, ১৬/৪

আর তিনি-ই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। —সুরা ফুরকান, ২৫/৫৪

তারপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে তিনি তার বংশধরদের সৃষ্টি করেন।

—সুরা সিজদা, ৩২/৮

আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি, —সুরা ইয়াসিন, ৩৬/৭৭

তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী, স্খলিত শুক্রবিন্দু হতে।

—সুরা নজম, ৫৩/৪৫-৪৬

তোমরা কি ভেবে দেখেছো যা (বীর্য) তোমরা ফেলে দাও। তার থেকে তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? —সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬/৫৮-৫৯

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু তেকে। —সুরা দাহর, ৭৬/২

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ তরল পদার্থ হতে সৃষ্টি করিনি?

—সুরা মুরসালাত, ৭৭/২০

তিনি তাকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেন। —সুরা অ'াবাসা, ৮০/১৯

তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে। —সুরা তারিক, ৮৬/৬

দেখা যায় বিভিন্ন সুরায় অনেক আয়াতে কোরানে বলা হয়েছে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, মাটি, পোড়া বা এঁটেল, মাটি ও শুক্র, স্খলিত শুক্র, তরল পদার্থ বা জমাট রক্তবিন্দু হতে। সব কিছু এক সাথে দেখলে বলা যায় আল্লাহর হাতে দুটি মূল উপাদান ছিল, মাটি ও শুক্র, যা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন মানুষকে। কোরানের প্রথম যে ওহী নাজেল হয় রসুল মোহাম্মদের ওপর তাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন জমাট রক্তবিন্দু হতে (সুরা আলাক ৯৬/২)। আল্লাহ কি তবে আদিপিতা মানবকে সৃষ্টি করার পর আর মাটিতে হাত দেননি। না হয় কিছু 'নির্বাচিত' মানবকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুধু মাটি থেকে। এই সব প্রশ্নের উত্তর কোরান থেকে পাওয়ার কথা নয়। নেইও কোরানে। পানি ও তরল পদার্থ, শুক্র বা জমাট রক্ত সব কিছুকে পুরুষের স্খলিত শুক্রের নানা রূপ বলে ধরে নিতে পারি। কোরানে হয়তো রূপক অর্থেই তা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু শুক্র সৃষ্ট হয় পুরুষে, নারীতে নয়। তাহলে কী নারীর কোনও অবদান নেই মানব সন্তানের জন্মে। আল্লাহ বলেননি। মানুষের জন্মে স্খলিত শুক্রের সাথে যে নারীর নিঃসরিত ডিম্বানুরও প্রয়োজন হয় কোরানের কোথাও তার উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় না। স্খলিত শুক্র ও নিঃসরিত ডিম্বানুর সার্থক নিষিক্তকরণেই হতে পারে শুধু নতুন সৃষ্টির উন্মেষ। নারী রজঃস্রাবের কালে অশুচি হয়ে যায় সেকথা বারবার বলা হয়েছে কোরানে। সেই রজঃস্বলা নারী ছাড়া যে মানুষ সৃষ্টি হত না সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি নারীকে। কোরানের একটি আয়াতে শুধু নারীর প্রসঙ্গ দেখা যায়।

এ (শুক্র) নির্গত হয় সুলব (মেরুদণ্ড, নরের যৌন দণ্ড অর্থে) ও তারাইব (পঞ্জর, নারীর যৌনদেশ অর্থে) এর মিলনে। —সুরা তারিক, ৮৬/৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে নর-নারীর যৌন মিলনের ইংগিত আছে। রয়েছে নরের শুক্রের কথা। কিন্তু নেই নারীর ডিম্বাণুর কথা। পুরুষের স্খলিত, বেগবান শুক্রকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কোরানে। কিন্তু নারীর নারীত্ব সেখানে উপেক্ষিত। কোনও স্বীকৃতি নেই, সব পুরুষকেই তার জন্মের জন্যে ঋণী থাকতে হয় নারীর কাছে। সেই ঋণ শুধু নারী জঠরে সন্তান ধারণ করে বলেই নয়। উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান নারীকে অন্যের সন্তান গর্ভে গ্রহণ করার ক্ষমতাও দিয়েছে, কিন্তু সেখানেও আরও একজন নারী তার ডিম্বানু দান করেছিল বলেই ভ্রূণ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। শুধু পুরষ দ্বারা সৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় না। কোনও কালেই হয়নি। আল্লাহর কোরানে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই বলে আমাদর তা ব্যথিত করে। অথচ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র ধর্ম—

> নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর একমাত্র ধর্ম। —সুরা আল-ই-ইমরান, ৩/১৯
>
> আর মুসলমান হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদল। তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল। মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে।
>
> তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।
>
> —সুরা আল-ই. ইমরান, ৩/১১০, ১৩৯

আল্লাহর এই ইসলামে নারীকে সৃষ্টিধাত্রী রূপে পূর্ণ স্বীকৃতি নেই। নারীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পুরুষের দেহ থেকে। তার নর্ম সংগিনীরূপে। নতুন সৃষ্টির জন্যে নয়, নারী তার জন্মের জন্যে পুরুষের কাছে ঋণী, পুরুষ তার জন্মের জন্যে ঋণী নয় নারীর কাছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহর রসুল ও নারী

হজরত মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন আরব ভূমির মক্কা নগরীকে ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। ২৫ বছর বয়সে তিনি প্রথম বিয়ে করেন বিবি খাদিজাকে। তখনকার আরবে বিবি খাদিজা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলা এবং সফল ব্যবসায়ী ও বণিক। তিনি নিজেই তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করতেন। মোহাম্মদের সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। এর আগেও তাঁর দুবার বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁদের ঔরসে তিনি পুত্র-কন্যার জননীও হয়েছিলেন। মোহাম্মদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছাতেই ১৫ বছরের ছোট মোহাম্মদকে তিনি পতি রূপে বরণ করেছিলেন। মোহাম্মদ ছিলেন তাঁর বেতনভুক অনেক কর্মচারীদের মধ্যে একজন। খাদিজার ওপর একটি সুন্দর সনেট রচনা করেছেন বাংলাদেশের কবি ফরহাদ মজহার। সেই সনেটটি তুলে ধরছি—

বিবি খদিজার নামে আমি এই পদ্যটি লিখি:
বিসমিল্লাহ কহিয়া শুধু খদিজার নাম নেবো।
প্রভু, অনুমতি দাও। গোস্বা করিওনা, একবার
শুধু তাঁর নামে এ পদ্য খানি লিখিব মা'বুদ।

নবীজীর নাম? উহুঁ, তাঁর নামও নেবোনা মালিক
শুধু খদিজার নাম—অপরূপ খদিজার নামে
একবার দুনিয়ায় আমি সব নাম ভুলে যাব
তোমাকেও ভুলে যাব ভুলে যাব নবীকে আমার।

একমাত্র তিনি, প্রভু, একমাত্র তাঁর চাকুরিতে
উট ও ব্যবসা লয়ে ছিল মোর নবীজী বহাল।
তুমি ডাঁট মারিওনা—নবী ছিল তোমার হাবীব
কিন্তু খদিজার ছিল বেতনের বাঁধা কর্মচারী—

সব নারী জানে তুমি খাটো হয়ে আছো এইখানে
তোমার খাতিরে তবু প্রকাশ্যে তা জাহির করেনা।

(ফরহাদ মজহার, 'বিবি খদিজা', এবাদত নামা: ৩৬)

হজরত মোহাম্মদ যে বিবি খাদিজার বেতনের বাঁধা কর্মচারী ছিলেন ইসলামী জগৎ তা খুব

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বেশী মনে করতে চায় না। পাছে তাতে করে খাদিজার মর্যাদা ছাড়িয়ে যায় মোহাম্মদকে অতিক্রম করে।

মোহাম্মদ নবুয়ত লাভ করেন ৪০ বছর বয়সে। বিবি খাদিজার বয়স তখন ৫৫ বছর। তারপরও তিনি ১০ বছর বেঁচে ছিলেন। মোহাম্মদকে তিনি সবরকম সহায়তা প্রদান করেন। তিনি-ই প্রথম মোহাম্মদের নব প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করেন। বলা যায় তিনি-ই প্রথম মুসলমান। এই পৃথিবীতে মোহাম্মদের প্রথম অনুসারী। বিবি খাদিজা না থাকলে নতুন নবী কোনওভাবেই ইসলাম প্রচারে সাফল্য লাভ করতেন না। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় খাদিজার এই দানের সাথে কোনও কিছু তুলনীয় নয়। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস সেইভাবে তুলে ধরেনি খাদিজাকে নারী বলে। তিনি তাঁর অর্থ-সম্পদ, সামাজিক প্রভাব নিয়ে ইসলামের ঊষালগ্নে মোহাম্মদের পাশে না দাঁড়ালে কী হতো এখন তা শুধু গবেষণার বিষয়। মোহাম্মদের ঔরসে তাঁর ৭টি পুত্রকন্যা জন্ম নিয়েছিল। পুত্ররা সব অকালপ্রয়াত। বেঁচে ছিলেন শুধু কন্যারা, তাঁরাও দীর্ঘজীবন লাভ করেননি। মোহাম্মদের জীবদ্দশায় তিনকন্যা মারা যান। নবীর পরলোক গমনের ৬ মাসের মধ্যে মারা যান কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমা। মহররমে বিশ্ব মুসলিম যাঁদের স্মরণ করেন তিনি সেই হাসান-হোসেনের জননী। বিবি খাদিজা প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী নারী ছিলেন। আমরা তা বুঝে নিতে পারি মোহম্মদের পরবর্তী বিবাহিত জীবনের দিকে তাকালে। মোহাম্মদের সাথে খাদিজার বিবাহিত জীবন ছিল ২৫ বছর। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে মোহাম্মদ ৪০ বছরের বিগত যৌবনা থেকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধা খাদিজাকে নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁদের 'সুখী' দাম্পত্য জীবনের খ্যাতি আছে ইসলামের ইতিহাসে। মোহাম্মদ সেই সময় অন্য কোনও নারীর পাণিগ্রহণ করেননি (না করতে পারেননি)। অথচ আরব সমাজে তাই ছিল প্রচলিত প্রথা। ২৫ বছর মোহাম্মদ একপত্নীক ছিলেন। খাদিজার মৃত্যুর পর পত্নীব্রত সেই মোহাম্মদ অল্পদিনের মধ্যে বহুপত্নীক হয়ে ওঠেন। বিয়ে করা পত্নীদের বাইরেও তিনি সুন্দরী দাসীদের সাথে মিলিত হন। আরব সমাজে তা নিন্দনীয় ছিল না। এই যে দীর্ঘকাল মোহাম্মদ খাদিজাকে নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন তার পিছনে কী কারণ ছিল আমরা তা উদ্ধার করতে পারব না। ইসলামের ইতিহাস ইচ্ছা করেই যেন কোন সূত্র রাখেনি। মোহাম্মদের সেই সংযম যত না গৌরবান্বিত করেছে তাঁকে তার চেয়েও বেশী করেছে বিবি খাদিজাকে। খাদিজার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রতাপের কাছে মোহাম্মদ ম্লান ছিলেন। এটাই বাস্তব ঘটনা।

বিবি খাদিজা মারা যান ৬২০ খ্রিস্টাব্দে। মোহাম্মদের নবুয়তের দশম বর্ষে। তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই মোহাম্মদ বিয়ে করেন সাওদাকে। মাত্র কয়েকদিন পর বিয়ে করেন হজরত আবুবকরের কন্যা আয়েশাকে। তিনি তখন ৬ বছরের বালিকা, কিশোরীও নন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মার্গোলিউথ মনে করেন তখন আয়েশার বয়স ছিল ৭। তখনো তাঁর রজঃদর্শন হয়নি। ৯ বছর বয়সে (মতান্তরে ১০) আয়েশা রসুলের ঘরে আসেন এবং তার অঙ্কশায়িনী হন। মোহাম্মদের সাথে আয়েশার বয়সের পার্থক্য ছিল ৪৫ বছরের। রসুল মোহাম্মদের জীবনে এই বিয়ে ইসলামের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ বিবি আয়েশাকে রসুলের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন— এই ব্যাখ্যা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি।

ইসলামে নিবেদিত প্রাণ নবীর অনেক জীবনীকার বলেন, হজরত আবুবকরের ইচ্ছাতেই এই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি রসুলের সথে একটা স্থায়ী পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তার জন্যে ৬ বছরের কন্যাকে তুলে দিতে হল ৫২ বছরের মোহাম্মদের হাতে। ৬ বছরের বালিকা কী বিয়েতে সম্মতি দিতে পারে? এই প্রশ্ন কী রসুল মোহাম্মদকেও আলোড়িত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেনি? সেই থেকেই ইসলামে বালিকা বিবাহ জায়েজ হয়ে গেছে। রসুল এই বৈধতা দিয়ে গেছেন। বিয়েতে নর-নারী উভয়ের যে সম্মতির প্রয়োজন হয় তা অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। পিতা বা অভিভাবকরা নাবালিকা কুমারী কন্যাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছেন তাদের মতামতের মূল্য না দিয়ে। রসুলপত্নী আয়েশার বিয়ে সেই মহৎ উদাহরণ রেখে গেছে মুসলমানদের কাছে।

ইসলামে কুমারী কন্যাদের পিতা জোর করে বিয়ে দিতে পারেন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন Ibn Timiyya, যাঁকে বলা হয় Sheikh of Islam (ইসলামের শেখ)। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ইসলামী বিশ্বে বিপুল।

> "Even if the virgin is an adult, her father may force her to get married. This is in accordance with Malek Ibn Ons, al-Shafi and Ibn Hambal's."

তিনি আরো বলেছেন,

> "The young virgin can be forced by her father to get married without being consulted."

এই ব্যাপারে ইসলামের বিভিন্ন মজহাব শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীরাও একমত,

> "A father can force his virgin daughter, his maid-slave and his male-slave to get married."

এখানে কুমারী কন্যার ওপর পিতার অধিকার অনেক দূর চলে গেছে। কুমারী কন্যা এখানে তুলনীয় হয়েছে ক্রীতদাস-দাসীদের সাথে।

ঐই ব্যাপারে ইবনে হাজমের (Ibn Hazm) মত হল,

> "A father may give his consent to have his young virgin daughter married without obtaining her permission, for she does not have a choice, exactly as Abu Bakr El Sedick did to his daughter, Aisha, when she was six years old. He marriod her to the prophet Muhammad without her permission."

ইবনে হাজম আরো বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত কন্যা অক্ষতা কুমারী থাকে ততক্ষণ সে পিতা বা অভিভাবকের সম্পত্তি। বিয়েতে তার মত গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই। কন্যার একবার বিয়ে হয়ে গেলে তার কুমারীত্ব মুছে যায়। শুধু তখনি তার নিজের ওপর অধিকার জন্মে। স্বামী মারা গেলে বা তালাক দিলে পুনর্বিবাহেই শুধু সে মত দিতে পারে। কুমারী অবস্থায় একটি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে এই হল ইসলামের অধিকার।

আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম। আবার মোহম্মদের বিয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সাওদা এবং আয়েশাকে বিয়ে করার পর মোহাম্মদ এরপরও একের পর এক নারীকে বিয়ে করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত ওমরের কন্যা হাফসা এবং রসুলের পালিতপুত্র জায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী জয়নব। মোহাম্মদের বিবাহিত পত্নীর সংখ্যা ছিল ১৩, মতান্তরে ১১। ডঃ ওসমান গনি তাঁর নবীজীবনী "মহানবী"-তে ১৩ জন পত্নীর কথা বলেছেন।

মোহাম্মদের আরো অনেক জীবনীকার তাঁর ১৩ জন বিবাহিত পত্নীর কথা বলেছেন, নবীর পত্নীরা হলেন :

১. খাদিজা
২. সাওদা
৩. আয়েশা (হজরত আবুবকরের কন্যা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. হাফসা (হজরত ওমরের কন্যা)
৫. জয়নাব বিনতে খোজাইমা
৬. উম্মে সালমা
৭. জয়নাব (জায়েদের তালাকপ্রাপ্তা পত্নী)
৮. জুওয়াইরিয়া
৯. রায়হানা (ইহুদী)
১০. মারিয়া (খ্রিস্টান, মিশরের শাসনকর্তার উপহার)
১১. সুফিয়া (ইহুদী)
১২. উম্মে হাবিবা (আবু সুফিয়ানের কন্যা)
১৩. মায়মুনা

এছাড়া আরো কজন নারীর নাম পাওয়া যায় বিভিন্ন সূত্রে, যাঁরা মোহাম্মদের উপপত্নীর মর্যাদা পেয়েছিলেন, যেমন :

১. ফাতেমা
২. শারবাফ
৩. খাওলা
৪. উম্মে শুরায়েক

তাঁরা একসময় রসুলের দাসী থাকলেও পরে মুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। অনেক জীবনীকার তাঁদের রসুলের বিবি বলেও উল্লেখ করেছেন।

নবীর জীবনী ও ইসলামের ইতিহাসের ওপর বিখ্যাত গ্রন্থ সৈয়দ আমীর আলীর "দ্য স্পিরিট অব ইসলাম।" সেখানে নবীর ১১ জন পত্নীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ইহুদী পত্নী রায়হানা বা মিশরের আমিরের উপহার মেরী বা মারিয়ার নাম নেই। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর "মরু ভাস্কর" বা মাওলানা আকরাম খানের "মোস্তফা চরিতে" নবী পত্নী হিসাবে রায়হানাকে খুঁজে পাওয়া যায়না। মারিয়াকে নবী বিবাহিত পত্নীর মর্যাদা দিয়েছিলেন কিনা এই ব্যাপারে অনেকেই সন্দিহান। সৈয়দ আমীর আলী মোহাম্মদের প্রতিটি বিবাহকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সবগুলিকে প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত বলে মন্তব্য করেছেন, তিনি মোহাম্মদের বহুবিবাহকে দেখেছেন—

> প্রাচীনকালের মহান ধর্মগুরুদের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে উদ্দেশ্য মুহম্মদকে বহুস্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণে পরিচালিত করেছিল এবং যা অসহায় বা বিধবা নারীদেরকে অন্য কোন উপায়ের অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকবার সুযোগ প্রদান করেছিল তা পক্ষপাতযুক্ত ও কপট শত্রুদের ঈর্ষাপরায়ণতা বিকৃত করেছে। তাদেরকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে মুহম্মদ একমাত্র উপায়ে, যা সে যুগ ও জনগণ সম্ভব করেছিল, তাদের পুনর্বাসন করেছিলেন। পরিস্থিতির অজ্ঞতার দরুন ও মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত সততার অভাবে অনেকে ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের একটি ভিত্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর খ্রীষ্টান আক্রমণকারীরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহুবিবাহ করে আইন সমর্থন করে না এমন সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং প্রেরিতপুরুষের পক্ষে উপযুক্ত নয় এমন চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞান এবং পরিস্থিতির অধিকতর সঠিক মূল্যায়ন তাঁকে আত্মতুষ্ট একজন কামুক প্রমাণ না করে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে যখন তিনি পুরাতন গোষ্ঠীপতি—প্রথানুসারে বিবাহিত স্ত্রীদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেছিলেন অথচ নিজে দরিদ্র ও সম্বলহীন ছিলেন, তখন তিনি চটুল নয় এমন চরিত্রের আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বিশ্বাস করি যে মানবিকতার দিক থেকে তাঁর উদ্দেশ্যসমূহের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ "মহান আরব্য পুরুষের" বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগসমূহের অসত্যতা ও অনুদারতা প্রতিপন্ন করবে। যখন মুহম্মদের বয়স মাত্র পঁচিশ, যখন তিনি যৌবনের প্রারম্ভে, তখন তিনি খাদিজাকে বিবাহ করেন যিনি বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বিবাহের পর থেকে পঁচিশ বৎসর কাল পর্যন্ত খাদিজার সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক জীবন অখণ্ড, বিশ্বস্ততা ও শান্তির সূর্যকরোজ্জ্বল আভায় অতিবাহিত হয়েছিল। পৌত্তলিকগণ যে সব নিন্দাবাদ ও নির্যাতন তাঁর উপর স্তূপীকৃত করেছিল তাঁতে খাদিজা ছিলেন তাঁর একমাত্র সাথী, সমব্যথী ও সাহায্যকারী। খাদিজার মৃত্যুকালে মুহম্মদের বয়স হয়েছিল একান্ন বৎসর। তাঁর দুশমনগণ একথা অস্বীকার করতে পারেন না বরং তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে এই দীর্ঘকালের মধ্যে তারা তাঁর চরিত্রে একটি মাত্র কলঙ্কও দেখতে পান না। খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি কোন বিবাহ করেননি। যদিও তিনি পছন্দ করলে জনমত তা অনুমোদন করত। মুহম্মদ যে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছিলেন তা তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন—এই উক্তি সম্পর্কে এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, এ কথা অজ্ঞাতপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিযরতের কয়েক বছর পরে মদিনায় বহুবিবাহের উপর সীমা আরোপিত হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে যে ব্যবস্থা তা একজন কামুকের সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে একজন আত্মসচেতন আত্মসমীক্ষকের সচেতনভাবে আরোপিত ভার ছিল। তাঁর সমুদয় বিবাহচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল বহুবিবাহের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পূর্বে এবং এই প্রত্যাদেশের সঙ্গে অন্য একটি প্রত্যাদেশ নাজিল হল যার ফলে তাঁর থেকে সব-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হল। যখন তাঁর অনুসারীরা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি প্রাপ্ত হল (আইনের শর্তাধীন) এবং হযরতের প্রকাশ্য নিন্দা সত্ত্বেও অদ্যাবধি তারা যে সুবিধা এখনও ভোগ করে আসছে—তালাকের পর নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত। কিন্তু তাঁর বেলায় তিনি যে সব স্ত্রীদেরকে ভরণপোষণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন তাদের কাউকে তালাক দিতে পারতেন না কিংবা অন্য কোন বিবাহ করতে পারতেন না। এটা কি "সুযোগ" গ্রহণ ছিল কিংবা তাঁর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের জন্য এটা ছিল অনুকম্পাসম্মত ব্যবস্থা ছিল না—আর তাঁর প্রত্যাদিষ্ট কার্যে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এটা কি পূর্ণাঙ্গ আত্মত্যাগের প্রত্যাদেশ ছিল না?

(দ্য স্পিরিট অব্ ইইলাম)

খাদিজা যতদিন বেঁচে ছিলেন, মোহাম্মদের নবুয়ত লাভের আগে ও পরে, মোহাম্মদ কোনও ২য় নারীর দিকে ফিরে তাকাননি। এই উক্তির পক্ষে যত বিশ্লেষণই তুলে ধরা হোক না কেন, তাতে যত না আবেগ তত যুক্তি নেই। আমরা মোহাম্মদের সেই সংযমকে দেখেছি খাদিজার প্রবল ব্যক্তিত্বের সাথে মিলিয়ে। না হলে খাদিজার জীবনাবসানের কয়েক মাসের মধ্যেই নারী-উদ্ধারের সব প্রয়োজন চলে আসত না মোহাম্মদের জীবনে। সৈয়দ আমীর আলী মোহাম্মদের কয়েকটি বিবাহকে পুত্র লাভের কথা ভেবেই করেছিলেন বলে মনে করেন। এই ভাবনার মধ্যেও একটা ইংগিত আছে। খাদিজার মৃত্যুর পর মোহাম্মদ যত নারীকে বিয়ে করেছিলেন তা সুরা নিসার ৩নং আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্বে বলে সৈয়দ আলী যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ও মতান্তর রয়েছে ইসলামী পণ্ডিতদের মধ্যে। তবে এক পর্যায়ে আল্লাহ মোহাম্মদকে বিয়ের ব্যাপারে ইতি টানতে বলেছিলেন (সুরা আজহাব, ৩২/৫২)। তবে তিনি মোহাম্মদের জন্যে পত্নীদের তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন তা বোধ হয় ঠিক নয় (সুরা তাহরিম, ৬৬/৫)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদের পত্নীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই। মোহাম্মদ পত্নীদের মধ্যে তাঁর 'দিন' সমভাবে বন্টন করে দিয়েছিলেন। সেই রুটিন মেনে তিনি এক এক পত্নীর ঘরে যেতেন। এই নিয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। রসুল কী তাঁর পত্নীদের সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন বহুবিবাহ করার পর, যা ছিল আল্লাহর নির্দেশ। সমদৃষ্টিতে দেখা দূরে থাক্ মোহাম্মদ পত্নীদের মধ্যে শয্যাসাম্যও বজায় রাখতে পারতেন না। নানা বিতর্কে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

শুধু পত্নীদের মধ্যে নয়, নারীদের মধ্যে রসুল সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন সুন্দরী আয়েশাকে। হজরত ওমরের এক প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেছিলেন নবী। একমাত্র আয়েশার ঘরে থাকার সময় তাঁর ওপর ওহী নাজেল হয়, অন্য কোনও পত্নীর সাথে থাকার সময় নয়। আয়েশা তাঁর প্রিয়তমা পত্নী (বোখারি শরীফ— ১২২৭)। আয়েশার বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র ন বছর। আয়েশার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ রসুলের অন্যান্য পত্নীগণের মনে সপত্নী যাতনার সৃষ্টি করেছিল। এক পর্যায়ে এই ব্যাপারে দেন-দরবার করার জন্যে তাঁরা রসুল-কন্যা ফাতেমাকে পাঠিয়েছিলেন মোহাম্মদের কাছে। কন্যা পিতার কাছে গিয়েছিলেন আয়েশা ছাড়া অন্য বিমাতাদের স্বার্থ নিয়ে পিতাকে বোঝাতে। একই কাজে পরে রসুলের আরেক পত্নী আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবাকেও নিয়োগ করা হয়েছিল। রসুল সব শুনেছিলেন। তবুও তিনি আয়েশার দিকেই ঝুঁকেছিলেন। আয়েশার উরুর ওপর মাথা রেখেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অন্তিমশয্যাও তৈরী হয়েছিল আয়েশার ঘরে।

এই যে প্রিয়তমা পত্নী কিশোরী আয়েশা তাঁকেও ভুল বুঝেছিলেন রসুল। সাফওয়ান-ইবনে মোয়াত্তাল নামে একজন সাহাবাকে জড়িয়ে আয়েশাকে নিয়ে একটি অপবাদ রটেছিল। রসুল সেই অপবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে আয়েশাকে তালাক পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন তিনি। হজরত আলীর বক্তব্য থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় হাদীসে (বোখারী শরীফ, ১৮৫৯-৬১)। কোরানেও এর ইঙ্গিত রয়েছে।

> যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো আমাদেরই একটি দল। এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্ঠকর মনে কোরো না, বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল আর ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।
>
> যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। —সুরা নূর, ২৪/১১, ২৩

হজরত মোহাম্মদের জীবনে সবচেয়ে বিতর্কিত বিয়ে ছিল জয়নবের সাথে বিয়ে। জয়নব ছিলেন হজরতের ফুফাতো (পিসতুতো) বোন। জায়েদ বিন হারিস ছিলেন দক্ষিণ সিরিয়ার বনি কাম নামে এক খ্রিস্টান গোত্রের ছেলে। শৈশবে তাঁকে দস্যুরা হরণ করে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। বিবি খাদিজা তাঁকে ক্রয় করে মোহাম্মদকে উপহার দেন। মোহাম্মদ জায়েদকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। জায়েদকে মুক্ত করে দেন তিনি। খবর পেয়ে জায়েদের পিতা ও ভ্রাতা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে আসলে তিনি যেতে অস্বীকৃত হন। প্রথম যে কজন পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন জায়েদ তাঁদের একজন। মোহাম্মদ জায়েদকে পালিতপুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং নিজের নাম জায়েদের সাথে যুক্ত করে দেন। সেই থেকে জায়েদ পরিচিত হন জায়েদ বিন মোহাম্মদ বলে। মোহাম্মদ ঘোষণা করেন জায়েদ তাঁর পুত্র। তিনি জায়েদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করবেন এবং জায়েদ করবেন তাঁর (W. Muir—'The life of Mohammad', p-35)। জয়নাবকে মোহাম্মদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দ করেন জায়েদের বধূরূপে। উচ্চ হাশেমী বংশের কন্যা জয়নাবের এই বিয়েতে প্রাথমিক আপত্তি থাকলেও মেনে নেন রসুলের নির্দেশে। আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

> আল্লাহ ও রসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে-বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। —সুরা আহজাব, ৩৩/৩৬

বিয়ের পর জায়েদকে মেনে নিতে পারছিলেন না জয়নব। তিনি মোহম্মদের অন্যতমা পত্নী হতে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত জায়েদ জয়নবকে তালাক দেন। এই ব্যাপারেও রসুলের নির্দেশ ছিল বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। পরে জয়নবকে মোহাম্মদ তাঁর অন্যতমা পত্নী রূপে গ্রহণ করেন। পালিত পুত্রের বধূকে বিয়ে করা যায় কিনা তা নিয়ে মোহাম্মদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁকে উদ্ধার করেন, অবতীর্ণ হয় ওহী।

> তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোক ভয় করেছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত ছিল। তারপর জায়েদ যখন (জয়নবের সাথে) বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমনীকে বিয়ে করতে বিশ্বাসীদের কোনো বাধা না হয়।
>
> আল্লাহ নবির জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোনো বাধা নেই।
>
> —সুরা আজহাব, ৩৮/৩৭-৩৮

জয়নবের সাথে মোহাম্মদের বিয়ের খবর শুনে বিবি আয়েশা মন্তব্য করেছিলেন, "রসুল যা কামনা করেন আল্লাহ সাথে সাথে তা অনুমোদন করেন"। এই উক্তি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে আয়েশার এই মন্তব্য।

সেই থেকে ইসলামে দত্তক বা পালিত সন্তান গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

> আর পোষ্যপুত্র যাদেরকে তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। তোমরা ওদেরকে ডাকো ওদের পিতৃপরিচয়ে। —সুরা আহজাব, ৩৩/৪-৫

রসুল মোহাম্মদের জীবনে আর একটি বিতর্কিত অধ্যায় মারিয়ার সাথে যৌন-সংগম। কাহিনীটি বহুল আলোচিত এবং নানাভাবে হাদীসে দেখা যায়। মূল বিষয়টা আমরা তুলে ধরছি।

মারিয়া ছিলেন হজরত ওমর কন্যা রসুল-পত্নী হাফসার দাসী। মিশরের শাসনকর্তা মুকাউকিস অন্যান্য উপহারের সাথে এই সুন্দরী খ্রিস্টান রমণীকেও মোহাম্মদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। দাসী হিসেবেই নবী তাঁকে অন্তঃপুরে স্থান দেন এবং হাফসার সেবায় নিয়োগ করেন। সেদিন ছিল হাফসার ঘরে রসুলের আসার নির্দ্ধারিত 'দিন'। ঘরে এসে রসুল দেখেন হাফসা গেছেন তাঁর পিতা ওমরের কাছে, মতান্তরে রসুল ঘরে এসে হাফসাকে ওমরের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হাফসার অবর্তমানে মোহাম্মদ মারিয়াকে ডেকে নেন এবং সঙ্গমে রত হন। হাফসা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে ঐ অবস্থায় মোহাম্মদকে দেখে ফেলেন। মোহাম্মদ অনুতপ্ত হন। হাফসা নবীকে বলেন, "হে আল্লাহর নবী, আমার বাড়িতে, আমার দিনে এবং আমারই শয্যায়"। মোহাম্মদ হাফসাকে চুপ করতে বলেন এবং অনুরোধ করেন এই ঘটনা অন্য কাউকে না বলতে। তিনি আল্লাহর নামে শপথ করেন যে ঐ দাসীকে আর কোনও দিন স্পর্শ করবেন না। হাফসা ক্ষিপ্ত হলেও নিজেকে সংযত করেন। কিন্তু রসুলের অন্য স্ত্রীদের না বলে শুধু আয়েশাকে সব জানিয়ে দেন। রসুল এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন এবং ঠিক করেন যে, সব পত্নীদের তিনি শাস্তি দেবেন এবং একমাস তাঁদের শয্যা বর্জন করবেন। এরপর অবতীর্ণ হয় আল্লাহর ওহী।

> স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভাল করে উপদেশ দাও। তারপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের বিছানায় দেও না ও তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খুঁজবে না। —সুরা নিসা, ৪/৩৪

পত্নী ছাড়াও দাসী-সঙ্গম রসুলের জন্যে অবৈধ নয়। যেমন নয় যে কোনও মুসলমানের জন্যে। মারিয়ার সাথে রসুলের সংগমকে তাই আল্লাহ অনুমোদন দান করেন। সেই সাথে তিনি সতর্ক করে দেন রসুলের অন্যান্য পত্নীদের—

হে নবি! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন কেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ তোমাদের স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য।

আল্লাহ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (স্মরণ করো) নবি তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। তারপর সেই তা অন্যকে বলে দেয়, আর আল্লাহ নবিকে তা জানিয়ে দেন।

তোমাদের হৃদয় যা কামনা করেছিল তার জন্য তোমরা দুজন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে চাও। —সুরা তাহরিম, ৬৬/১-৪

কোরানে বর্ণিত এই দুইজন নারী হচ্ছেন মোহাম্মদের দুই পত্নী হাফসা ও আয়েশা। এক পর্যায়ে রসুল সব পত্নীদের তালাক দেওয়ার কথাও ভাবেন। নবী স্ত্রীদের তালাক দিলে তাঁদের কিছুই করার ছিল না। কারণ বিধাতাপুরুষ আল্লাহ ছিলেন নবীর সহায়। মোহাম্মদের স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার ইঙ্গিত কোরানেও রয়েছে।

নবি যদি তোমাদের সকলকে তালাক দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে হয়তো তোমাদের চেয়েও আরও ভালো স্ত্রী তাকে দেবেন। —সুরা তাহরিম, ৬৬/৫

হজরত ওমরের প্রচেষ্টায় সেই যাত্রায় নবী পত্নীরা মুক্তি পেয়ে যান তালাকের খড়্গ থেকে। নবীর অনেক জীবনীকার মনে করেন দাসী মারিয়াকে রসুল মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। কারো কারো রচনায় মোহাম্মদের পত্নী তালিকায় মারিয়ার নাম দেখা যায়। এমনও হতে পারে রসুল মারিয়াকে বিয়ে করেছিলেন হাফসার ঘরে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর। মারিয়ার গর্ভে রসুলের এক পুত্র সন্তানেরও জন্ম হয়েছিল। শৈশবে সেই পুত্রও মারা যায়। আরব সমাজে পুত্রের জনক হতে না পারলে পুরুষের মর্যাদা লোপ পায়। তাকে বলা হয় 'আবতার'। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'যার লেজ কাটা গেছে'। শব্দটি তিক্ত। এই তিক্ত শব্দটি মোহাম্মদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল তখনকার আরব সমাজে তাঁর শিশু পুত্রের মৃত্যুর পর। প্রচলিত সামাজিক অপবাদ থেকে আল্লাহ আবার রসুলকে মুক্ত করেন।

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসুল ও শেষ নবি। —সুরা আহজাব, ৩৩/৪০

মোহাম্মদ নবুয়ত লাভ করার আগে ও পরে প্রথম বিবাহিত জীবনের ২৫ বছর যেভাবে কাটান পরবর্তী জীবন কাটিয়েছেন বহু পত্নী নিয়ে। তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বৈধতা পেয়ে তাঁর 'ডান হাতের অধিকার ভুক্ত দাসী'দেরও প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করেছেন,

(মুহাম্মদ!) এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয় আর তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়, যদি ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধও করে, তবে তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়।

—সুরা আহজাব, ৩৩/৫২

যত খুশী ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীকে ভোগ করতে পারতেন মুসলমানরা। কোনো সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়নি। কিন্তু বৈধ স্ত্রী হতে পারবে শুধু ৪ জন। কিন্তু আল্লাহ মোহাম্মদকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ব্যাপারে ছাড় দিয়েছিলেন। তিনি যে কবার বিয়ে করেন আল্লাহ অনুমোদন করেন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুসলিম। ইহলোকে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আল্লাহর আনুগত্যের সাথে রসুলের আনুগত্য না করলে মুসলমান হওয়া যায় না।

বলো, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো।
বলো, 'আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও।' —সুরা আল-ই-ইমরান, ৩/৩১-৩২

আল্লাহ ও রসুল যেন অভিন্ন। একজন ছাড়া অন্যজন অপূর্ণ। আমরা এই প্রসঙ্গে কোরানে অনেক আয়াত দেখেছি। আমরা এই প্রসঙ্গ আর বিস্তারিত করব না।

যাঁরা বলেন তখনকার বিদ্যমান আরব সংস্কৃতি, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণে মোহাম্মদকে অনেকগুলি পত্নীকে তাঁর ঘরে তুলতে হয়েছিল, তাঁদের সাথে রসুলের অনেক জীবনীকার ও ঐতিহাসিক একমত হতে পারেননি। রসুলের দাসীর সাথে কোরান অনুমোদিত সংগমকে আরব সমাজ-সংস্কৃতির বাস্তবতা বলে তাঁরা মেনে নিতে চান না। বিশেষ করে যাঁর ঘরে অতগুলি পত্নী থাকে তার বেলায়।

মোহাম্মদ ২৫ বছরে বিয়ে করেছিলেন বিবি খাদিজাকে। তাঁর যখন ৫০ বছর অতিক্রান্ত তখন খাদিজার জীবনাবসান। তাঁর জীবনকার এবং কোরানের ভাষ্যকাররা বলেন এই দীর্ঘ ২৫ বছরের বিবাহিত জীবনে মোহাম্মদ খাদিজা ছাড়া অপর কোনো নারীর সাথে যৌনতায় জড়িয়েছেন তেমন কোনও উদাহরণ নেই। কলঙ্কশূন্য এক পত্নীব্রত ছিলেন তিনি। খাদিজা মারা যাওয়ার পর ৫১ বছর থেকে ৫৯ বছর বয়সের মধ্যে অপর বিয়ে করেন ১২ জন (মতান্তরে ১০) নারীকে। তখন মোহাম্মদের যৌবন অস্তগামী। তিনি এসব বিয়ে করেছিলেন সামাজিক বাস্তবতার প্রয়োজনে বলে দাবি করেন ইসলামী ঐতিহাসবিদরা। কিন্তু পাশ্চাতের ঐতিহাসিকরা এই মত সমর্থন করেন না। অনেকে আবার এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ হাদীসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কাতাদাহ (সাহাবা, নবীর ঘনিষ্ঠ সহচর) আনস (অপর সাহাবা) হতে বর্ণনা করেছেন যে রসুল (সময়ে) একই রাত্রে বা দিনে পর পর মধ্যবর্তী ফরজ গোসল ব্যাতিরেকে এগার বিবির সাথে সঙ্গম করতেন (নয় জন বিবাহ সূত্রের, দুইজন শরিয়তী স্বত্বাধিকার সূত্রের)।

কাতাদাহ বলেন, আমি আনসকে জিজ্ঞেস করলাম, হজরতের কি এতই শক্তি ছিল? তিনি বললেন আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে রসুল ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত ছিলেন।

(বোখারী শরীফ—১৯০। মাওলানা আজিজুল হক অনূদিত পৃ. ৩১৩)।

বোখারী হাদীস নিয়ে মুসলমানরা কোনও প্রশ্ন তোলেন না। এই হাদীস সংগ্রহকে সহীহ হাদীসের মর্যাদা দেওয়া হয়। হাদীস ও নারী নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি।

মোহাম্মদের ১৩ জন বিবাহিত পত্নীর বাইরে আরো কজন নারী তাঁর পত্নী হতে চেয়েছিলেন বলে বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরাও ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন ১২ জন সপত্নীর (লোকান্তরিতা খাদিজাকে না ধরে) সাথে নবীর 'দিন'। এইসব নারীরাও মনে হয় জান্নাতে মোহাম্মদের সান্নিধ্যের প্রত্যাশী ছিলেন। মোহাম্মদ তাঁদের গ্রহণ করেননি। পত্নীর সংখ্যা আর বাড়াতে চাননি তিনি। হতে পারে ততদিনে আল্লাহ তাঁর নতুন নতুন নারীকে উদ্ধার করার ওপর ইতি টেনে দিয়েছেন।

রসুলের কোনও কোনও জীবনীকার বলেছেন—কোনও বিয়েতেই তাঁর নিজের দিক থেকে তাগিদ বা উদ্যোগ ছিল না। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই সেই সব নারীরা ছিলেন 'লালায়িত'। তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দেশ্য ছিল পত্নীত্বের সম্পর্কের জোরে তাঁরা ইহকালে ও পরকালে পাবেন আল্লাহর রসুলের সাহচর্য। তাঁরা রসুলের স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে জান্নাতবাসিনী হবেন। তাঁরা ইহকালে মোহাম্মদের প্রদত্ত নির্দ্ধারিত 'দিন' পেয়েছিলেন। আখেরাতে তাঁরা কী পাবেন কোরান ও হাদীসে তার কোনও উল্লেখ নেই। তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করলেও সেখানে উত্তম বাসস্থান পাবেন হয়তো। খাদিজার কথা বলা আছে হাদীসে। অন্য পত্নীদের কথা কিছু বলা নেই। কোরান ও জান্নাত নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি।

বোখারী শরীফের ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ হাদীসে বলা হয়েছে, খাদিজা বেহেশতের মধ্যে একটি শূন্যগর্ভ এক মাতর তেরা একটি সুরম্য অট্টালিকা পাবেন যা হবে নীরব-নিরালা এক শান্তি নিকেতন।

বেহেশতে খাদিজা মোহাম্মদের সান্নিধ্য পাবেন কীভাবে তা বলা নেই হাদীসে, কোরানেও। মোহাম্মদকে না পেলে সেই নীরব-নিরালা শান্তিনিকেতনে তিনি একাকী কীভাবে কাটাবেন?

বলা হয় মোহাম্মদ কোনও বিয়েই নিজের উদ্যোগে করতে চাননি। তিনি শুধু সেইসব নারীদের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। বিধবাদের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাদের উদ্ধার করেছেন। বিভিন্ন গোত্রে এবং সম্প্রদায়ে বিয়ে করে তিনি শত্রুভাবাপন্ন গোত্রসমূহের সাথে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সহজতর হয়েছে। বহু বিবাহ ছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞার উদাহরণ। আবার আমরা খাদিজাকে স্মরণ করি। এই রাজনৈতিক কারণ এবং বাধ্যবাধকতা কী খাদিজার সময়ে একবারও অনুভূত হয়নি? উত্তর দিতে আমার অপারগ।

কোনও কোনও জীবনীকার তো মনে করেন,

হজরত আমাদের জন্যে তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে একটি পরিপূর্ণ আদর্শ। তাই মানব জীবনের যতরকম সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তার পূর্ব ধারণা নিয়েই তিনি এই বহুবিবাহ করেছিলেন।

বিধবা বিবাহের প্রচলন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহবন্ধন অবৈধ প্রেম-অনাচার-ব্যভিচারের পথরোধ, সপত্নীদের মধ্যে স্বার্থ ত্যাগ ও উদারতা এসবই হজরতের বহু বিবাহের মাধ্যমে আদর্শ স্থাপনের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

অর্থাৎ কেবল বিধান, আদেশ, নিষেধ দ্বারা নয়, বাস্তব আদর্শ তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গেছেন।

এই বহুবিবাহের ভিতর দিয়ে মহানুভতা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং মানব প্রেমের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

('হেরা পর্বতের সেই কোহিনুর'—শাহ সুফী শেখ শামসউদ্দিন আহমদ)

মোহাম্মদের বহুবিবাহের পক্ষে এই মূল্যায়নে আবেগ আছে। মোহাম্মদ এখানে আর 'মানুষ' নেই। তাকে ছাড়িয়ে গেছেন। বিশ্বাসী মানুষের কাছে তিনি বহুবিবাহের পক্ষে 'মহৎ' আদর্শের যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সমকালেও তা নিয়ে বিতর্ক কম ছিল না। তিনি সব পত্নীদের প্রতি সমভাব বজায় রাখতে পারেননি। কারো কারো দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নীদের মধ্যে সপত্নী যাতনাও দূর করতে পারেননি। আমরা কোরান-হাদীস থেকেই তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি।

দাস ব্যবস্থা ইসলাম অনুমোদিত। তখন এই প্রথা ছিল আরবের সামাজিক বাস্তবতা। রসুল তাকে মেনে নিয়েছিলেন। অনেক দাসকে মুক্ত করলেও সকলকে তিনি মুক্ত করেননি। তাঁর অনেক দাস ছিল। অন্তপুরে ছিল অনেক দাসী। দাস-দাসীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতেন। তবে দাসীদের ব্যবহার করেছেন যৌনতার প্রয়োজনে। হাদীসেই তার উল্লেখ রয়েছে। কোরানে রয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ইংগিত। তাকে তো অস্বীকার করা যাবে না। মৃত্যুর মাত্র একদিন আগে তিনি সকল দাস-দাসীকে মুক্তি দিয়ে যান। যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ জন।

(মাওলানা আবুল কালাম আজাদ—'মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা', পৃ. ২১১, অনু.—হাবিব আহসান)।

রসুল আয়েশা ছাড়া আর কোনও কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেননি। অন্য পত্নীরা সকলেই ছিলেন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা, কিন্তু সকলেই বিগতযৌবনা নন। একমাত্র ব্যতিক্রম সাওদা। তিনি ছিলেন প্রৌঢ়া, সুন্দরীও ছিলেন না। রসুলকে যত্নের সাথে সেবা করতেন। কিন্তু একটা সময়ে রসুল তাঁকেও তালাক দিতে চেয়েছিলেন। সাওদা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আবেদন করেছিলেন তাঁকে রসুলের পত্নীত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করতে। সাওদা তাঁর জন্যে বরাদ্দ দিন পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন আবুবকর কন্যা আয়েশাকে। সাওদা সেইভাবে তাঁর পত্নীত্ব রক্ষা করেছিলেন। মায়মুনাও প্রৌঢ়া ছিলেন। রসুল তাঁকে বিয়ে করেছিলেন হজপালনরত এহরাম (হজের বিশেষ পোশাক) বাঁধা অবস্থায়। (বোখারী শরীফ—৯৩৯)।

সুরা তাহরিমের প্রথম আয়াত (৬৬/১) নিয়ে আরো একটি হাদীস রয়েছে।

(সহীহ মুসলিম— ৩৪৯৬)।

মোহাম্মদ মধু খেতে পছন্দ করতেন। রোজ সকালে তিনি জয়নবের (জায়েদ যাঁকে তালাক দিয়েছিলেন) ঘরে যেতেন মধু খেতে এবং কিছু সময় কাটাতেন। আয়েশা ও হাফসা এটা পছন্দ করতেন না। তাঁরা রসুলকে বললেন তাঁর মুখ থেকে মগফুর গন্ধ বের হচ্ছে। মগফুর আরকত (Mimosa) নামে এক বৃক্ষের দুর্গন্ধযুক্ত নির্যাস। মোহাম্মদ মধু খাওয়া ছেড়ে দিলেন। তখনি আল্লাহর ওই ওহী এসেছিল তাঁর কাছে। মোহাম্মদের পত্নীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। তিনি তাঁদের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা হয়তো করতে পেরেছিলেন সমানভাবে। কিন্তু তাঁদের প্রতি সমদৃষ্টি দিতে পারেননি। সেটা হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাবে না।

AMARBOI.COM

রসুলের খ্রিস্টান পত্নী মারিয়া (মতান্তরে উপপত্নী) পুত্র সন্তান লাভ করলে তাঁর প্রতি রসুল বিশেষ দৃষ্টি দেন। তখন এই নিয়ে আয়েশা ও হাফসাসহ অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে রসুলের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই পর্যায়েও তিনি পত্নীদের কয়েকজনকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন বলে জানা যায়।

রসুল বলেছেন আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন তালাককে। কিন্তু দেখা যায় তিনিও বারবার তালাক নামে অস্ত্র ব্যবহার করতে চেয়েছেন পত্নীদের ওপর। আল্লাহর রসুলের পত্নীদের প্রতি যদি সহনশীলতা এই পর্যায়ে থাকে তাহলে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা সেই যুগেও কী ছিল আমরা তা ভেবে নিতে পারি।

তবে রসুল কোনও স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেননি শেষ পর্যন্ত সেকথাও সত্যি নয়। রসুলের এক বিবাহিতা পত্নী ছিলেন আসমা (নোমান কিন্দির কন্যা)। তিনি নিজেই নাকি মুক্তি চেয়েছিলেন। তাই রসুল তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। রসুলের কোনও কোনও জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, মোহাম্মদের সাথে আসমার কোনরকম যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি অর্থাৎ বিয়ে কনজুমেট করেনি (সা'দ উল্লাহ—'ইসলাম ও নারী', দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ২২ আগস্ট, ১৯৯৭)। আমরা ধরে নিতে পারি এই বিয়ে ধরে রাখতে চাননি আসমা। কিন্তু কোন্ সমাজ-বাস্তবতায় এই বিয়ের প্রয়োজন হয়েছিল আমাদের জানা নেই।

রসুল অনেক বিধবা নারীকে বিয়ে করে তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসুলের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। তাদের বলা হয় উম্মুল মুমেনীন, মুসলমানদের জননীস্বরূপা। কোরানে আল্লাহ নির্দেশ পাঠান রসুলের উম্মতদের প্রতি।

> নবি বিশ্বাসীদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও কাছের, আর তার স্ত্রীরা তাদের মায়ের মতো। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেওয়া বা তার মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা সংগত হবে না। —সূরা আহজাব, ৩৩/৬. ৫৩

মোহাম্মদ যখন মারা যান তখন আয়েশার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন তিনি। ভোগ করেছিলেন দীর্ঘ বৈধব্য-যন্ত্রণা। তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। তিনি কী মুসলমানদের অনেক মাতার একজন হয়ে তৃপ্ত ছিলেন! এই প্রশ্ন করা যায় না।

মোহাম্মদ মুসলমান ছাড়াও ইহুদী ও খ্রিস্টান রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। এই দুই ধর্মানুসারীদের ইসলাম কিতাবের অধিকারী বলে মনে করে। ইহুদীতের তৌরাত ও খ্রিস্টানদের ইঞ্জিন কোরানেও মান্যতা পায়। তাই পূর্বে ধর্মান্তরিত না করেও এই দুই ধর্মের নারীকে বিয়ে করতে ইসলাম কোনও বাধা নিষেধ আরোপ করে না। পরে ধর্মান্তরিত হলেও চলে। কিন্তু পৌত্তলিকদের বেলায় ইসলামে ধর্মান্তরিত না হলে কোনও ভাবেই নয়। ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু যেখানে সুযোগ নেই সেখানেও ইসলাম কোনও ছাড় দেয় না।

নারী তো শুধু পত্নী নয়, জননীও। হাদীসে বলা হয়েছে, "জননীর পায়ের নীচে বেহেশত।" এখানে যোগ করা উচিত ছিল সেই জননীকে হতে হবে বিশ্বাসী নারী। না হলে তা আর বেহেশত থাকবে না। মোহাম্মদের মা আমিনা তাঁর শৈশবেই মারা যান। তখনো ধর্ম হিসাবে ইসলামের উন্মেষ হয়নি। আমিনানন্দন মোহাম্মদের নবুয়ত লাভ তো অনেক অনেক পরের ঘটনা। স্বাভাবিক কারণেই মোহাম্মদজননী আমিনা ইসলাম-বিশ্বাসী নারী ছিলেন না। সেই জন্যে মোহাম্মদ গর্ভধারিনীকেও মর্যাদা দিতে পারেননি। জননীর কবর তিনি কোনওদিন জিয়ারত (ইসলামী অনুযায়ী পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা) করতে চাননি, তিনি পৌত্তলিক ছিলেন বলে। জননীর প্রতি শ্রদ্ধাকে এখানে ছাড়িয়ে গেছে ধর্মবিশ্বাস। ইসলামে সব কিছুই যেন খণ্ডিত। মহত্তর মানবিক চেতনায় উদ্ভাসিত নয়। মোহাম্মদ জননীর বেলায়ও সেই গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসুলের উত্তরাধিকার

"বিয়ে করবে স্বাধীন নারীদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার জনকে।"

আবার তুলে ধরলাম সুরা নিসার সেই বিখ্যাত আয়াতের অংশ (৪/৩)। মুসলমানদের আল্লাহ এক সাথে চার জন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার বৈধতা দান করেছেন। তবে তারা এর বাইরে তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের উপপত্নীরূপেও রাখতে পারতেন। তাদের বেলায় সংখ্যাটা মুসলমানদের প্রয়োজন ও নিজস্ব বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে দেওয়া হয়নি। রসুল হজরত মোহাম্মদ ছিলেন এই আয়াতের বাইরে। তাঁর জন্যে স্ত্রীর সংখ্যা চারজনের মধ্যে বেঁধে দেননি আল্লাহ। হজরত মোহাম্মদের উপপত্নীও ছিল। তিনি ছিলেন আল্লাহর শেষ নবী শুধু নন, শ্রেষ্ঠ নবীও। মহানবীর মর্যাদা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই আয়াত তাঁর প্রিয় সাহাবাদের হাতে কী পরিণতি লাভ করেছিল তা আমরা দেখে নিতে পারি ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ চারজন খলিফা, খোলাফায়ে রাশেদীনের, জীবনযাপন থেকে। তাঁরা ইসলামের বিশ্বে আদর্শ পুরুষ, প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁদের বন্দনাগানে মুখর ইসলামের ইতিহাস। কিন্তু তাঁরা সকলেই ছিলেন বহুপত্নীক। কারো জীবনেই যৌনতা নিয়ে কোনও ত্যাগ নেই। ইসলামে বৈরাগ্যের অনুমোদন নেই। কিন্তু তাই বলে মহৎ ব্যক্তিত্বদের যৌনজীবনও অনিয়ন্ত্রিত থাকবে এটা ভাবা যায় না। এই ব্যাপারে সকলেই যেন অনুসরণ করেছেন রসুলকে।

চতুর্থ খলিফা আলী ছিলেন মোহাম্মদের পিতৃব্যপুত্র। যে পিতৃব্য মোহাম্মদকে শৈশবে-কৈশোরে লালন করেছিলেন। আমৃত্যু যিনি ছিলেন মোহাম্মদের অভিভাবক। বলা যায় মোহাম্মদ ছিলেন আবু তালেবের পোষ্যপুত্র। তিনি যে স্নেহ উজার করে দিয়েছিলেন মোহাম্মদকে, মোহাম্মদ যেন তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আলীকে। অপুত্রক মোহাম্মদের পুত্রতুল্য ছিলেন আলী। আলীর সাথে মোহাম্মদ বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা, আদরের দুলালী ফাতেমাকে। সেই আলী যখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে চান ফাতেমাকে ঘরে রেখে অন্য এক নারীকে নবী মোহাম্মদ অনুমতি দেননি (বোখারী শরীফ - ২০৫৪)। তিনি বলেছিলেন ফাতেমা তাঁর দেহের অংশ, কন্যার অমর্যাদা তিনি করতে দিতে পারেন না। এই পাত্রী ছিল বনু হিশাম বিন আল-মুগিরার কন্যা। এই ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় সহীহ বোখারী ও অন্যান্য হাদীসে। খাদিজা যতদিন জীবিতা ছিলেন মোহাম্মদ আর কোনও নারীকে ঘরে তুলতে পারেননি। তেমনি খাদিজা কন্যা ফাতেমা যতদিন জীবিতা ছিলেন আলীকে দ্বিতীয় নারীর পাণিগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। মোহাম্মদ নিজে তখন ছিলেন বহুপত্নীক। কিন্তু আলীর বেলায় তাঁর শর্ত ছিল ফাতেমাকে তালাক না দিয়ে অন্য কোনও নারীকে তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। রসুল কন্যাকে তালাক দেওয়ার সাহস কী আলীর ছিল! কিন্তু ফাতেমার মৃত্যুর পর আলী কী করলেন? তিনি আরও দশটি রমণীকে বিয়ে করেন। আল্লাহর আইন মেনেই করেছেন। তারপর তালাক দিয়েছেন এক একজন বিবিকে দেনমোহরের অর্থ পরিশোধ করে। তাছাড়াও তাঁর ছিল ১৯জন উপপত্নী ও অধিকারভুক্ত দাসী। তিনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি তাঁর নাবালিকা কন্যাদের দান করেছিলেন ২য় খলিফা ওমর

ও ৩য় খলিফা ওসমানকে। তাঁরা সেই কন্যাদের গ্রহণ করে আলীর সাথে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করেছিলেন। আলীর ছিল ১৪জন পুত্রসসন্তান।

হজরত ওমরের শৌর্য, বীর্য, মহত্ত ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের খ্যাতি ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। রূপকথার মত তাঁর জীবন ছিল আড়ম্বরহীন। তিনি বিয়ে করেছিলেন সাতজন নারীকে। সেই বিয়েও কোরানের আইন মেনেই। তাঁর দুইজন অধিকারভুক্ত দাসীও ছিল ফাখিয়া ও লাহিয়া নামে। হজরত ওসমান বিয়ে করেছিলেন আটজন নারীকে। হজরত আবুবকরও একপত্নীক ছিলেন না।

খোলাফারে রাশেদীনের স্বর্ণযুগের খলিফা চতুষ্টয়ের নিরহঙ্কার ও নিষ্কলুষ জীবন ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের শৌর্য, বীর্য ও চরিত্রের দৃঢ়তা নিয়ে আমরা কোনও অশ্রদ্ধা পোষণ করছি না। কিন্তু তাঁরা যে নারীর সমানাধিকার স্বীকার করতেন না তা তো স্পষ্ট। আর যাই হোক তাঁরা নারীর বন্ধু ছিলেন না কোনও অর্থেই।

রসুল হজরত মোহাম্মদের শাসনকালে নারীরা মসজিদে যেতেন। মৃত্যুর পর মৃতের জানাজায়ও অংশ নিতেন। রসুলের একটি হাদীস রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে "আল্লাহর বান্দীগণকে আল্লাহর মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না" (বোখারী শরীফ—৪১২)। রসুলের জানাজায়ও নারীরা অংশ নিয়েছিলেন। হজরত ওমর এসব পছন্দ করতেন না। তিনি অসিয়ত করে যান যে তাঁর জানাজায় যেন কোনও নারী অংশগ্রহণ না করে। হজরত ওমরের খেলাফত থেকেই নারীদের মসজিদে যাওয়া এবং জানাজায় অংশগ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

তালাক আইনও সংশোধন করে যান খলিফা ওমর। আগে তিন তালাক একসাথে দেওয়া যেত না। ওমরের সময় একসাথে তিন তালাক দেওয়ার নিয়ম চালু হয়ে যায়। ইসলামী আইনবিদরা কোরানের নতুন ভাষ্য তৈরি করে কোরানের তালাক বিধির নতুন ব্যাখ্যা দেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, তখনকার বিদ্যমান বাস্তবতার দাবিতেই সেটা করতে হয়েছিল খলিফা ওমরকে। কিন্তু যে সামাজিক বাস্তবতা নারীর প্রতিকূল ছিল তখন, তাকে আইনসিদ্ধ করতে হল মহৎ খলিফা ওমরকে সেকথা আমরা ভুলি কী করে।

বহুবিবাহে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন রসুলের রক্তের উত্তরাধিকার হাসান। হজরত আলীর পুত্র ও মোহাম্মদের দৌহিত্র। তিনি তাঁর জীবনকালে ৭০টি নারীকে বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পুত্রকন্যার সংখ্যা ছিল ৩১। তিনি কোনও কোনও দিনে চারজন পত্নীকেই তালাক দিয়ে নতুন চারজনকে বিবাহ করেছেন এমন নজীরও আছে। ইসলামের আইনে তাতে কোনও বাধা নেই। হাসানের পিতা আলী যখন খলিফার আসনে সমাসীন, তিনি ইরাক বাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন হাসানের হাতে কন্যা সমর্পণ না করতে। কুফা বাসীরা জানতেন হাসানের তালাক-প্রীতির কথা। তবুও তারা হাসানকে কন্যা দান করে গেছেন যদি হাসানের ঔরসে তাদের কন্যার গর্ভে রসুলের বংশধর জন্ম নেন। সকলেই তখন মনে করতেন ফাতেমার গর্ভজাত রসুলের দৌহিত্ররাই শুধু তাঁর রক্তের উত্তরাধিকার বহন করে।

খলিফাদের বিভিন্ন জীবনীকার এই সব ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন (The Biday and the Nihaya by Ibn Kathir)।

এই ধারা সগৌরবে বহমান ইসলামের ইতিহাসের উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে। তাঁদের শাসনামলে তাঁদের চার জন কোরানসম্মত বৈধপত্নী ছাড়াও সহস্র রমনীতে হারেম পূর্ণ থাকত। তাঁদের অধীনে যেখানেই মুসলিম শাসন ছিল সেখানেই নবাব-বাদশারা হারেমে রক্ষিত নারীদের নিয়ে চরম বিলাসবহুল জীবন যাপন করে গেছেন। ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের নিয়ে কত গল্প-কাহিনী। কিন্তু কোনো নিন্দাবাদ ধ্বনিত হয়নি। তাকে মেনে নেওয়া হয়েছে ইসলামের স্বীকৃত বাদশাহী বিলাস বলে।

একেবারে হাল আমলের ঘটনা, বিংশ শতাব্দীর। ইসলামের দুই পবিত্র ও পুণ্য নগরী মক্কা মোয়াজ্জেমা ও মদীনা মনোয়ারা। তার হেফাজতকারী এখন সৌদি আরবের রাজকীয় সরকার। যে রাজকীয় শাসনব্যবস্থা ইসলাম অনুমোদন করে না বলেই দাবি করা হয়। সৌদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মোহম্মদ ইবনে সউদের বংশধর বাদশাহ (Absolute King) আবদুল আজিজ ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সউদি আরব নামে রাষ্ট্রটি। বাদশাহ আবদুল আজিজ বিয়ে করেছিলেন ৩০০-র বেশি নারীকে। তাঁর একসময়ের বিবাহিত পত্নীরা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে উপপত্নীরূপে ঢুকে যেত বাদশাহের হারেমে। বাদশাহ আবদুল আজিজের ছিল ৪৪টি পুত্র এবং অসংখ্য কন্যা সন্তান। অন্তত দুই হাজার রাজকুমার এখন বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সউদের বংশধর।

ইসলামের খলিফা, শাহেনশা, বাদশাহ, নবাবরা নাকি কোরানকে অতিক্রম করেননি।

> আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী নেওয়া ঠিক কর আর তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক তবুও তার থেকে কিছুই নেবে না। —সুরা নিসা, ৪/২০

ইসলামে পুরুষদের বহু বিবাহের এই উত্তরাধিকার তাদের ধর্মীয় অধিকার। যে পরিপ্রেক্ষিত ও সামাজিক বাস্তবতায় ইসলামে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল, বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশে দেশে তা এখন অন্যতম আলোচনার বিষয়। অনেক দেশ আইন করেই নিষিদ্ধ করেছে বহুবিবাহ, সব দেশ করেনি। অনেক দেশে তো আবার নতুন করে ফিরে আসছে এই আইন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরান ও জান্নাত

জান্নাত বা বেহেশত শুধু মুসলমানের জন্যে। ইহলোকে আল্লাহকে কোরানের নির্দেশমত বন্দনা ও উত্তম কাজের জন্যে মুসলমানরা জান্নাতে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে। কোরানের আধুনিক সব অনুবাদে 'জান্নাত' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বেহেশত খুব কম। 'স্বর্গ' মুসলমানের জন্যে নয়। ওটা অমুসলমানদের খাতায় থাকুক। জান্নাত যে কী জগৎ (হয়তো ভুল বলা হল, জান্নাত তো জগৎ নয়) তার বর্ণনা রয়েছে কোরানে। কতভাবে না মুসলমানদের কাছে জান্নাতকে লোভনীয় করে তোলা হয়েছে। জান্নাত শুধু ভোগবিলাস, যৌনতা আর অনন্ত কামনার লীলাভূমি। সেখানে কী কী মিলবে কোরানের বিভিন্ন সুরায় অনেক আয়াতে তা তুলে ধরা হয়েছে। যা মানুষের কল্পনাকেও সুযোগ দেয় না। তাকে ছাড়িয়ে যায়। কোরানে এবং রসুলের হাদীসে কোরানের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় জান্নাতের চিত্র।

জান্নাত প্রাপ্ত মুসলমানদের মর্যাদা বা সুখ-শান্তির তারতম্য অনুসারে জান্নাতের মোট ৮টি ভাগ বা স্তর রয়েছে :

১. ফেরদাউস
২. নাঈম
৩. মাওয়া
৪. দারুল খুলদ
৫. আদনান
৬. ইল্লিয়ীন
৭. দারুস সালাম
৮. দারুল মাকাম

এ দুনিয়াতে সব মুসলমানের অর্জিত পুণ্যের পরিমান সমান নয়। তাই জান্নাতের এই স্তরবিভাগ। এই ব্যাপারে আল্লাহর বিচার একেবারে নিরপেক্ষ। তিনি যে আসল বিচারক। বিচারদিনের মালিক। রসুল মোহাম্মদের স্থান হবে বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম স্থানে, জান্নাতুল ফেরদাউসে। আল্লাহ তাঁকে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিশ্বের প্রতিটি মসজিদে দিনে পাঁচবার নামাজের আহ্বানে আজান দেওয়ার সময় সে কথা আল্লাকে স্মরণ করিয়ে দেন মুয়াজ্জিন।

> "হে আল্লাহ! তুমি এই পূর্ণ আজান ও উপস্থিত নামাজের মালিক। তুমি হজরত মোহাম্মদকে বেহেশতের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন ও সুমহান মর্যাদা দান কর। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গিকার।"

নবী করিমকে আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেমন কোনও প্রতিশ্রুতি কোনও নারী পাননি। তাঁরা যত বিশাল পুণ্যের অধিকারী হোন না কেন।

আরবভূমির উত্তর মক্কা অঞ্চলে মোহাম্মদের জন্ম ও জীবনকাল। তাঁর কর্মভূমি। যে দুটি

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

নগরী মক্কা ও মদীনাকে কেন্দ্র করে তিনি আবর্তিত হয়েছেন সেখানে জলের বড় অভাব। বেগবতী কোনও স্রোতস্বিনী নেই। ছোট নদীও নয়। আছে শুধু কিছু মরুদ্যান নগর থেকে বাইরে গেলে ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে। কিন্তু নদীর কথা আরববাসীরা শুনেছেন। নদী যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই এই জীবনে যা দেখা হল না পরলোকে গিয়ে যদি তার দেখা মেলে। আল্লাহ মুসলমানদের সেই নদীর দেশ জান্নাতে নিয়ে যেতে চান। নদী আছে আরব মরুবাসীর স্বপ্নে। সেই নদীর দেশে যাওয়ার জন্যে আল্লাহ তাদের প্রলুব্ধ করেন। আল্লাহ তাই কোরানের অনেক সুরায় বারংবার বলেছেন সেই কথা, "জান্নাতের নিচে নদী বইবে।" কোরানের দ্বিতীয় সুরা, সুরা বাকারায় আমরা প্রথম জান্নাত ও নদীকে একসাথে খুঁজে পাই।

> যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিচে নদী বইবে।
>
> —সুরা বাকারা, ২/২৫

কোরানের একেবারে শুরুতেই আমরা জান্নাতের দর্শন পেলাম। পেয়ে গেলাম নদীকেও। যে নদী জান্নাতের নিচে বহমান। এরপর এই নদীকে আমরা বহমান দেখেছি সুরা থেকে সুরায়। আয়াত থেকে আয়াতে। কোরানের অন্তত ২৩টি আয়াতে বলা হয়েছে জান্নাতের নিচে নদী বইবে।

আয়াতগুলি আমরা আর তুলে ধরলাম না। নদী ছাড়াও অনেক আয়াতে ঝরনার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে নহরের কথা। ইহলোকে কোনও আরব মুসলিম নারী কোনও নদী, ঝরনা কিংবা নহরের কাছে যেতে পারেননি। মরণের পরে জান্নাতে পারবে তেমন স্পষ্ট কথা কোরানে বলা নেই। আরব মরুবাসী পুরুষ বা রমণী, তাদের কাছে জল মহার্ঘ বস্তু। জলের বড় অভাব তাদের, তাই তাদের জন্যে জলের এত প্রলোভন জান্নাতে। এত বহমান নদী, ঝরনাধারা আর নহর। দুনিয়ায় নেক কাজের জন্যে মুসলমানদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ বারংবার। "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর অনুরাগী ও সাবধানিদের প্রত্যেককে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।"

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও বর্ণনা কোরানের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। কোরানের মোট আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬ এবং সুরার সংখ্যা ১১৪। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান মুহম্মদ হাবিবুর রহমান বিশিষ্ট কোরান-বিশেষজ্ঞ। তাঁর 'কোরান সূত্র' কোরানের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস, অসামান্য একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কোরানের কোন কোন সুরা এবং আয়াতে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে তা আমরা একসাথে পেয়ে যাই। তিনি দেখিয়েছেন কোরানের ১১৪টি সুরার মধ্যে ৫২টিতে জান্নাতের কথা রয়েছে। আর জান্নাত সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা ২৮৯। আমরা সুরার নামগুলি এবং আয়াতের সংখ্যা শুধু তুলে দিলাম।

> সুরা মুদদাসির, ৭৪/৩৮-৪১ ॥ সুরা ফাজর, ৮৯/২৭-৩০ ॥ সুরা মুরসালাত, ৭৭/৪১-৪৪ ॥ সুরা কাফ, ৫০/৩১-৩৫ ॥ সুরা কামার, ৫৪/৫৪-৫৫ ॥ সুরা সাদ, ৩৮/৪৯-৫৫ ॥ সুরা আরাফ, ৭/৪০, ৪২-৪৪ ॥ সুরা ইয়াসিন, ৩৬/৫৫-৫৮ ॥ সুরা ফুরকান, ২৫/১৫-১৬ ॥ সুরা ফাতির ৩৫/৩২-৩৫ ॥ সুরা মরিয়ম, ১৯/৬১-৬৩ ॥ সুরা তাহা, ২০/৭৫-৭৬ ॥ সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬/১০-৪০, ৮৮-৯১ ॥ সুরা ইউনুস, ১০/৯-১০, সুরা হুদ, ১০/২৩, ১০৮ ॥ সুরা হিজর, ১৫/৪৫-৫০ ॥ সুরা সাফফাত ৩৭/৩৯-৬২ ॥ সুরা জুমার, ৩৯/৭৩-৭৫ ॥ সুরা হা-মিম সিজদা ৪১/৩০-৩২ ॥ সুরা শুরা, ৪১/২২ ॥ সুরা জুখরুফ, ৪৩/৬৮-৭৩ ॥ সুরা দুখান, ৪৪/৫১-৫৭ ॥ সুরা আহকাফ, ৪৬/১৩-১৪ ॥ সুরা জারিয়াত, ৫১/১৫-১৯ ॥ সুরা গাশিয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৮/৮-১৬।। সুরা কাহাফ, ১৮/৩১, ১০৭-১০৮।। সুরা নাহল, ১৬/৩০-৩২।। সুরা ইব্রাহিম, ১৪/২৩।। সুরা মুমিনুন, ২৩/৮-১১।। সুরা সিজদা, ৩২/১৯।। সুরা তুর, ৫২/১৭,২৮।। সুরা হাককা, ৬৯/১৮-২৪।। সুরা ম'আরিজ, ৭০/২২-৩৫।। সুরা নাবা, ৩১-৩৯।। সুরা আন কাবুত, ২৯/৫৮-৫৯।। সুরা মুতাফফিফিন, ৮৩/২২-২৮।। সুরা বাকারা ২/২৫, ৮২, ১১১।। সুরা আল-ই-ইমরান, ৩/১৫-১৭, ১৩৩-১৩৪ ১৪২।। সুরা নিসা, ৪/৫৭।। সুরা হাদিদ, ৫৭/১২, ২১।। সুরা নাজিয়াত, ৭৯/৪০-৪১।। সুরা মুহাম্মদ, ৪৭/১২, ১৫ সুরা রা'দ, ১৩/২০-২৪, ৩৫।। সুরা রহমান, ৫৫/৪৬-৭৮।। সুরা দাহর, ৭৬/৫-২২।। সুরা তালাক, ৬৫/১১।। সুরা বাইয়িনাহ, ৯৮/৭-৯।। সুরা হজ্ব, ২২/১৪, ২৩-২৪।। সুরা তাহরিম, ৬৬/৮।। সুরা ফাতাহ, ৪৮/৫, ১৭।। সুরা মায়িদা, ৫/৮৩-৮৫, ১১৯।। সুরা তওবা, ৯/২০-২২, ৭২, ৮৮-৮৯, ১০০, ১১১।।

জান্নাত হল মুসলমান পুরুষদের জন্যে প্রলোভন। জান্নাত অর্থ অনন্ত কামনা। জান্নাত অর্থ চূড়ান্ত ভোগ। যা মর্ত্যবাসীর কল্পনাতে আসবে না। জান্নাতে মিলবে সুস্বাদু ফল-মূল-দ্রাক্ষা, খেজুর, ডালিম, কলা ও কণ্টকবিহীন বদরি (যা আরববাসীর প্রিয়), ছায়া (আরবে কোথায় আর সেই ছায়া) দুধের আর মধুর নহর। যা চাওয়া হবে তাই। পাওয়া যাবে কামনার সব কিছু। মদিরা আর শরাব। পবিত্র সুরা (জান্নাতের সুরাও পবিত্র)। কনক থালায় পরিবেশিত হবে খাদ্য। উজ্জ্বল একখানি পাত্রে শরাব। যত খুশী খাওয়া যাবে। জান্নাতে মাতাল হবে না কেউ। সেখানে তাদের স্বর্ণনির্মিত ও মুক্তাখচিত কঙ্কন দিয়ে অলংকৃত করা হবে, সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। এই দুনিয়াতে এইসব তাদের পরতে দেওয়া হয়নি। তাই আখেরাতে সেই সুযোগ করে দেওয়া। চাওয়ার আগেই তারা পেয়ে যাবে সবুজ মিহি মখমল ও রেশমের সব আবরণ। সবুজ রং আল্লাহর বড় প্রিয়। তাই জান্নাতের পোশাকের রংয়ের এই নির্বাচন। জান্নাতে মিলবে নারী আর নারী। এক-দুই-তিন-চার নয়, প্রতিটি পুরুষের জন্যে ৭২টি হুর (সংখ্যাটা কোরানে নেই। রয়েছে রসুলের হাদীস তিরমিজি শরীফে)। জান্নাতে যে আসন মিলবে তার যে কত বর্ণনা। সেখানে মুখোমুখি হেলান দিয়ে বসা যাবে। হুররা সব চিরকুমারী, আয়তনয়না, সমবয়স্কা। প্রেমময়ী সুরক্ষিত ডিমের মত উজ্জ্বল। তারা সব পবিত্র সঙ্গিনী। যাদের এর আগে কোনও মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি, অক্ষত যোনী সব তারা, মুক্তা, প্রবাল ও পদ্মরাগমণির মত। আয়তলোচনা হুরের সাথে শুধু মিলন আর মিলন। এই সব বর্ণনা কোরানের বিভিন্ন আয়াতের। সব কিছু ছাড়িয়ে কোরানের জান্নাত হল শরাব আর হুর। যৌনতার মানসভূমি। বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম সেই যৌনতা, তাই পারস্যের কবি হাফিজ এই দুনিয়াতেই তা পেতে চাইলেন। বেহেশতে যা পাওয়া যায় এই দুনিয়াতে তা চাওয়ার মধ্যে কোনও অপরাধ দেখেননি তিনি।

কোরান হাদীস সবাই বলে
পবিত্র সেই বেহেশত নাকি
সেথায় গেলে মিলবে শরাব
তন্বী হুরী ডাগর আঁখি।
শরাব এবং প্রিয়ায় মিলে
দিন কাটে মোর দোষ কী তাতে?
বেহেশতে যা হারাম নহে
মর্ত্যে হবে হারাম তা কি!

ইরানের কবি এখানে যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন তার উত্তর আমরা দিতে পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত হুর বা হুরী নিয়ে একজন মানুষ কী করে সামলাবে? জান্নাতে প্রবেশের পর একজন মুসলমান পুরুষ একশত জন পুরুষের সম্মান যৌন ক্ষমতা লাভ করবেন (হাদীস-তিরমিজি)। দুনিয়ায় যে বয়সেই তারা মারা যান জান্নাতে তারা ৩০ বছরের যুবক হয়ে প্রবেশ করবেন (হাদীস-মিশকাত)। তাদের হবে অনন্ত যৌবন। তাদের বয়স এক জায়গায় স্থির থাকবে জান্নাতে। আর কখনো বাড়বে না। হুররাও হবে অনন্তযৌবনা। প্রস্ফুটিত পদ্মের মত।

একটি হাদীসে হুরদের বর্ণনা দেখা যায়—

> হরিণনয়না স্বর্গসুন্দরীরা তাদের পত্নী হবে। তারা সবাই (৩৩/৩৪ বছরের পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত) সমবয়স্ক হবে।
>
> যদি বেহেশতের কোনো নারী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতো তবে তার দেহভরা মৃগনাভির সৌরভে পৃথিবী ভরপুর হয়ে যেতো এবং তার সৌন্দর্যে সূর্য ও চন্দ্র মলিন হতো।

ইমাম গাজ্জালীও এই হুরদের বর্ণনা দিয়েছেন। যে বর্ণনা চরম ইন্দ্রিয় উত্তেজক—

> সেখানে অপ্সরাসদৃশ পুণ্যময়ী নারীরা রয়েছে, আল্লাহ তাদের আলোকের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারা যেন মরকত ও প্রবালের মতো। আনতনয়না সে-নারীরা তাদের স্বামী ব্যতীত আর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, জ্বিন ও মানবদের মধ্যে কেউই তাদের ইতিপূর্বে স্পর্শ করে নি, তাদের স্বামীরা যখন তাদের সাথে মিলিত হবে তখন তাদের কুমারী দেখতে পাবে। তাদের গলায় থাকবে নানা রঙের সত্তরটা ক'রে হার, কিন্তু সেগুলো তাদের শরীরে একটা কেশের মতোও ভারী মনে হবে না। যেমন কাঁচের গ্লাসের লাল শরাব বাইরে থেকে দেখা যায় তেমনি তাদের অস্থি, মাংস, চর্ম কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়ে তাদের সর্বাঙ্গ দেখা যাবে। তাদের মাথার চুল মুক্তা ও পদ্মরাগমণি দ্বারা সুশোভিত থাকবে।

ইমাম গাজ্জালী বলেছেন জান্নাতের হুররা সব পুণ্যময়ী নারী। আলোক থেকে সৃষ্ট এই সব অপরূপা, অনন্ত যৌবনা, অক্ষতযোনী হুররা বিশেষ জান্নাতী পুরুষ ছাড়া আর কারও দিকে তাকাবে না। এই সব হুররা সেই পুরুষের স্ত্রী হবে। জান্নাতে মনে হয় বিয়ের প্রয়োজন হয় না। যৌনমিলনেই যে কোনও হুরের ওপর স্বামীত্বের অধিকার জন্মে যাবে। কিন্তু তারা যদি সংখ্যায় ৭২ জন হয় তাহলে কজন হুরের প্রতি সেই জান্নাতী পুরুষ সুবিচার করতে পারবেন? পুরুষ যে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার লাভ করছে সেটা তার পুরস্কার আল্লাহর কাছ থেকে। জান্নাতে তাই ইহলোকের স্ত্রীদের মত, হুর-স্ত্রীদেরও সতী-সাধ্বীর জীবন কাটাতে হবে। বিশেষ জান্নাতী পুরুষকে শুধু তৃপ্তি দান নয় তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু পুরুষের সেই দায় নেই। জান্নাতেও চরম বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হবে হুর নামে নারীরা। এটাই প্রভু আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান।

জান্নাতের কত বর্ণনা যে হাদীসে রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। রসুল মোহাম্মদ বলেছেন 'জান্নাতের মাটি হবে মেশাক জাফরানের। আল্লাহ কস্তুরী ও রজতের ইট দিয়ে তা নির্মাণ করেছেন। জান্নাতের সুখ ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা কোনও মানবসন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়, মর্তের মুসলমানরা সেখানে ৩০ বছরের যুবক হয়ে প্রবেশ করবে আর মুসলমান নারীরা রূপান্তরিত হবে ১৬ বছরের পূর্ণ যুবতীতে। হুররাও সকলেই ১৬ বছরের পূর্ণ যুবতী সমতুল হবে। জান্নাতে হুর, নারী, পুরুষ কারো বয়স বৃদ্ধি পাবে না। তারা চিরযৌবন লাভ করবে সেখানে।' নারী এবং হুরদের যৌবন কী তাহলে ১৬ বছরেই পূর্ণ বিকশিত হয়। কেন ১৬ বছরেই এই সীমা বেঁধে দেওয়া হল তা আমাদের জানা নেই। আমরা তো জানি ১৬ বছরেও নারী পূর্ণ সাবালিকাত্ব অর্জন করে না। তাহলে কিশোরীদের প্রতি এই আকর্ষণ কেন? হাদীসে আরো বলা হয়েছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আল্লাহ হুরদের এত সৌন্দর্য দান করেছেন যে তা কোনও মানুষ বর্ণনা করতে পারবে না। তাদের মুখের থুথু এত সুগন্ধপূর্ণ হবে যে তার এক ফোঁটা জলে পড়লে সমস্ত জল দুধের মত শুভ্র ও আতরের মত সুগন্ধময় হয়ে যাবে। যদি কোনও হুর রজনীর দিকে তাকান তবে সেই রজনী দিবসে রূপান্তরিত হয়। জান্নাতের এই হুররা হবে জান্নাতবাসী মুসলমানদের দাসী।' জান্নাতের কোনও এক হুরকে দেখে আল্লাহর প্রধান ফেরেশতা জিবরাইল জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। সেই হুর বলেছিলেন—'আমরা যাদের দাসী, আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন রসুল মোহাম্মদের উম্মতের মনোরঞ্জনের জন্যে।' আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন রসুল মোহাম্মদের উম্মতের মনোরঞ্জনের জন্যে।' আল্লার দূত ফেরেশতা জিবরাইলকেও জ্ঞান হারাতে হয় জান্নাতের অনন্তযৌবনা হুরকে দেখে। এমনি তাদের যৌনতার আকর্ষণ।

জান্নাতের পরিকল্পনা এবং মানসসৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে মর্ত্যের মুসলমান পুরুষদের জন্যে। এখানে যে প্রলোভন দেওয়া হয়েছে তা কাম উত্তেজনার, যৌনতার, প্রমোদের। এই জান্নাত মুসলমান রমনীদের জন্যে নয়। সতী-সাধ্বী মুসলমান স্ত্রীর জন্যেও নয়। আল্লাহর দুনিয়ায় তাদের অবস্থান অবরোধে, পুরুষের মনোরঞ্জনে আর সন্তান উৎপাদন। কল্পিত জান্নাতে তাদের জায়গা দেওয়া হয়নি। তারা সেখানে উপেক্ষিতা। অত হুরের মধ্যে সেখানে তারা কাকে খুঁজবে, করবেই বা কী? কোরানে পুরুষদের জান্নাতে প্রবেশের কথা কতবার কতভাবে বলা হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে তার কিছুই বলা হয়নি। জান্নাতের ওপর কোরানে ২৮৯টি আয়াত আছে। তার মধ্যে মাত্র ৫টি আয়াতে নারীকে খুঁজে পাওয়া যায়।

> আল্লাহ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার নিচে নদী বইবে—সেখানে তারা থাকবে চিরকাল—প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের।
>
> —সুরা তওবা, ৯/৭২

> তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।
>
> —সুরা জুখরফ, ৪৩/৭০

> (তিনি জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন) এজন্য যে তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে—যেখানে তারা স্থায়ী হবে।
>
> —সুরা ফাতাহ, ৪৮/৫

> সেদিন তুমি দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে। তাদের সামনে ও ডানপাশে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। বলা হবে, 'আজ তোমদের জন্য সুখবর জান্নাতের, যার নিচে নদী বইবে। —সুরা হাদিদ, ৫৭/১২

> স্থায়ী জান্নাত। সেখানে তারা প্রবেশ করবে আর তাদের পিতামাতা, পতিপত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। —সুরা রা'দ, ১৩/২৩

জান্নাত নিয়ে এত আয়াতের মধ্যে মাত্র ৫টি আয়াতে আমরা নারীকে দেখতে পাই। জান্নাতে নারীরা তাদের মর্তের স্বামীকে খুঁজে পাবে কিনা সে কথা কোথাও বলা নেই। যদি দেখাও মেলে স্বামী নামে সেই পুরুষটি মর্তের পুণ্যের ফলে ৭২ জন আয়তলোচনা চিরযৌবনময়ী হুর নিয়ে 'অন্য জীবন' যাপন করবে। মর্তের স্ত্রীদের জান্নাতে তো তার প্রয়োজন নেই। জান্নাতে সেইসব স্ত্রীদের চিনে নিয়েই বা কী হবে। এই হল ইহলোকে পতিব্রতা নারীদের জান্নাতের পুরস্কার। অবশ্য নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলে 'উত্তম বাসস্থান' পাবেন। সেই প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে। তবে উত্তম বাসস্থানে কীভাবে তারা দিন কাটাবেন তা কোথাও বলা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় সেখানেও তাদের অবরোধে থাকতে হবে। আল্লার তাই ইচ্ছা। তাদের দেহ তো আলো থেকে সৃষ্ট নয়। তারা তো জান্নাতের হুর নয়, তাদের জান্নাতের জীবন যেন আরও কষ্টের। ইহলোকে চতুর্থাংশ স্বামী হলেও বরাদ্দ ছিল তাদের জন্যে। জান্নাতে তেমন প্রতিশ্রুতিও নেই।

যে ৫টি আয়াতে জান্নাতে নারীর প্রবেশের কথা বলা আছে তার মধ্যে একটি হল জেহাদ-সংক্রান্ত (৪৮/৫)। জেহাদ অর্থ ধর্মযুদ্ধ। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যুদ্ধ। রসুলের আমলে একটাই অর্থ ছিল জেহাদের। ইসলাম মুসলমান পুরুষের জন্যে জেহাদকে বাধ্যতামূলক করেছে। নারীর জন্যে নয়। কোরানের পরের যুগের ভাষ্যকাররা (তফসিরকার) জেহাদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা জেহাদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হল আল-জেহাদ আল আকবর। অন্যটি আল-জেহাদ আল-আসগর। এদের মধ্যে প্রথমটিকে বলা যেতে পারে অন্তর্জেহাদ। রসুলের যুগে অন্তর্জেহাদের সুযোগ ছিল না। যারা জেহাদী তারাই শুধু জান্নাতের অধিকার পাবে। সুরা ফাতাহতে তাই বুঝি বলা হয়েছে। কিন্তু নারী তো এই আয়াতের অধিকার নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না? এই প্রশ্নের সরল উত্তর কোরানে নেই। কিন্তু হাদীসে আছে। "নারীর জন্য জেহাদ হল হজ", একটি হাদীসে বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে পতি সেবাকে। ইহলোকে পতিব্রতা নারীর আখেরাতে জান্নাত লাভ। পতির সেবা এমন-ই মহৎ কর্ম। এর পর আর বিতর্ক চলে না। সুরা রা'দের ১৩/২৩ আয়াতে নারীর কথা আলাদা করে বলা হয়নি। মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে নারী আছে। যার যার পুণ্যে সে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করে পিতামহ-পিতা-পুত্র-পৌত্র সকলেই তো নতুন জীবন লাভ করে যৌবন ফিরে পাবে। তাদের একই বয়স হবে। নতুন ভুবনে তারা ব্যস্ত থাকবেন হরিণনয়না হুরদের সেবা নিয়ে, ইহলোকের পরমাত্মীয়দের জান্নাতে খুঁজে তো লাভ নেই কোনও। প্রাসাদে টান পড়া শুধু। মাতা-জায়া-কন্যারা জান্নাতে গেলে তাদের চলে যেতে হবে সুন্দর বাসস্থানে, যার নিচে নদী বইবে। তাদের আর যেন কোনও চাওয়া থাকতে নেই। জান্নাতে নারীর জন্যে কোনও প্রলোভন নেই। সেখানে শুধু পুরুষের সহস্র পাওয়া। জান্নাতে নারীরা অবশ্য যৌবনবতী হয়েই প্রবেশ করবেন। কারণ সেখানে শুধু জয়গান যৌবনের। যুবতী হয়েই সেখানে প্রবেশ করতে হবে—এটাই জান্নাতের শর্ত। সে কথা রসুল বলে গেছেন তাঁর হাদীসে। কিন্তু তিনি আবার এও বলে গেছেন জান্নাতে নারীরা কম সংখ্যায় প্রবেশ করবে, দোজখীদের মধ্যে নারীরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। মহানবী একথা বলেছেন কী বলেননি তা নিয়ে বিতর্কও আছে, আমরা সেখানে ঢুকব না।

দুনিয়ার সতী-সাধ্বী নারী বেহেশতে গিয়ে অনন্ত-যৌবনা হবে সে কথা স্পষ্ট করে বলা নেই। পুরুষের বেলায় আছে। এই নারী বেহেশতে গিয়ে আদৌ তার স্বামীর সাথে অত হুরদের ডিঙিয়ে মিলতে পারবে কিনা তাও বলা নেই। জান্নাতে মর্ত্যের পতিকে নাহয় নাই পেল সাধ্বী পত্নীরা। কিন্তু তাদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা কোথায়? কোরানে কোনও ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। তাহলে বেহেশতে অনন্তযৌবন নিয়ে তারা কী করবে। পুরুষের বাহাত্তর হুর আর সহস্র দাসের বিপরীতে নারীর প্রাপ্তি শুধু উত্তম বাসস্থান। যার যোগফল শূন্য। নারীর জন্যে এই কোরানের জান্নাত। বেহেশতের মেওয়া।

শুধু হুর নয়। আল্লাহ পুরুষের জন্যে অন্য ব্যবস্থাও করে রেখেছেন জান্নাতে। পুরুষদের যে সমকামিতা এই দুনিয়ায় নিন্দনীয় জান্নাতে যেন তা বৈধ করে দিয়েছেন আল্লাহ। কোরানে নিষিদ্ধ সমকামিতার কথা বলা হয়েছে মাত্র দুটি আয়াতে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তোমাদের পুরুষদের মধ্যে যে-দুজন এ (ব্যাভিচার) করবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। তবে তারা যদি তওবা করে ও শুদ্ধ হয় তবে তাদের রেহাই দেবে।

—সুরা নিসা, ৪/১৬

তোমরা কি যৌন তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষের কাছে যাবে?

—সুরা নম্‌ল, ২৭/৫৫

দুটি আয়াতেই পুরুষের সমকামিতাকে খুব জোরের সাথে নিন্দা করা হয়নি। তওবা করে শুদ্ধ সমকামী দুই পুরুষকে ক্ষমা করে দিতে বলা হয়েছে। সুরা নিসার সংলগ্ন আয়াতেই (৪/১৫) অবৈধ যৌনাচারের জন্যে নারীকে যেখানে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই শাস্তি তুচ্ছ মনে হয়। এর কারণ হয়তো তৎকালীন আরব সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিত। ইসলাম পূর্ব আমলে আরব দেশে পুরুষদের মধ্যে সমকামিতার প্রচলন ছিল। মোহাম্মদ তাকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁর মন এক জায়গায় আবদ্ধ ছিল না। তিনি মনে করেছিলেন দুনিয়ায় এই যৌনসংগম নিষিদ্ধ করলে জান্নাতে তার সুযোগ এবং প্রলোভন থাকা উচিত। আরববাসীর মনের খবর তিনি রাখতেন। প্রাক ইসলামী যুগে আরবের এক বিখ্যাত কবি ছিলেন আবু-নুয়াস। সমকামি প্রেমকে উৎসাহিত করে তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার কটি লাইন :

A lad whom all can see girt with sword and belt
not like your whore who has to go yield
Make for smooth-forced boys and do your very best
to mount them, for women are the mounts of the devils.

(Perfumed devils)

জান্নাতে পাওয়া যাবে গিলমানদের। তাদের বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে 'চির কিশোর', তারা জান্নাতী পুরুষদের সেবা করবে। সেটা কোন্ সেবা? এত হুর থাকতে আবার গিলমানদের প্রয়োজন হল কেন? ভিন্ন রুচির পুরুষদের জন্যে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাইনি কোরানে-হাদীসে। জান্নাতের পুরুষরা যা কামনা করবে তাই তো পাবে। আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। জান্নাতে গিলমানরা রয়েছে ৪টি আয়াতে—

তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান (কিশোরেরা), যারা সংরক্ষিত মুক্তোর মতো।

—সুরা তুর, ৫২/২৪

তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরেরা।
পানপাত্র, কুঁজো ও ঝরণাঝরা সুরায় ভরা পেয়ালা নিয়ে।

—সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬/১৭-১৮

তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরেরা, যাদের দেখে মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তো। —সুরা দাহর, ৭৬/১৯

সংরক্ষিত মুক্তো বা বিক্ষিপ্ত মুক্তোর মত এই গিলমান বা চিরকিশোরেরা শুধু কী জান্নাতী পুরুষদের হাতে তুলে দেবে সোনার পানপাত্র? তার জন্যে চিরকিশোরদের কী প্রয়োজন ছিল? সেই কাজ তো আলোর হুর-রাই করছিল। এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।

সৈয়দ আমীর আলী মনে করেন জান্নাতের এত যে বর্ণনা (দ্য স্পিরিট অব ইসলাম) তা আল্লাহ রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। জান্নাতের এত সুখ, এত আনন্দ এত তৃপ্তি এর পিছনে রয়েছে গভীর তাৎপর্য। সৈয়দ আমীর আলী ইমাম গাজ্জালীর মত উল্লেখ করে বলেছেন, এই সুখ আল্লাহর আধ্যাত্মিক সন্দর্শন। মুসলমান ও আল্লাহর মধ্যে যে অন্তরাল তা বিদীর্ণ হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই সেই দৈহিক ও পার্থিব সুখের অনুভূতি। সৈয়দ আমীর আলী আরো বলেছেন কোরানের জান্নাতে হুরদের ধারণা জরথুস্ত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। জান্নাতের ধারণাও। এই কথা মেনে নিলে তো কোরানের মৌলিকতা, অসামান্যতা এবং সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়। সেই বিতর্কে আমাদের উৎসাহ নেই।

আমরা দেখেছি কোরানের জান্নাতে পুরুষদের জন্যে বাঁধভাঙ্গা যৌনতার ছড়াছড়ি। জান্নাতে পুরুষদের জন্যে অযুত আয়োজন। কিন্তু নারীর সেখানে উত্তম বাসস্থানে অবরোধের জীবন। তার জন্যে কোনও আয়োজন নেই। কোরান যেন তাই বলতে চেয়েছে। তাই এই জান্নাত নারীর জন্যে নয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাদীস ও নারী

কোরান ইসলামের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, পবিত্রতম। ইসলাম ধর্ম অনুসারী মুসলমানদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় কোরান দ্বারা। ইসলামের সব আইনের ভিত্তি হল কোরান।

এর পরেই হাদীসের স্থান। হাদীসকে বলা হয় কোরানের ব্যাখ্যা (Interpretation)। কোরান ইসলামের মূল সংবিধান, হাদীস শব্দের শাব্দিক অর্থ কথাবার্তা। নতুন কিছু যা পূর্বে ছিল না। আর শব্দের পরিভাষা হল নবী মোহাম্মদের কথাবার্তা, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মৌল সম্মতি। মোহাম্মদ যা বলেছেন, যা করেছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন পাওয়া গেছে তাই হল হাদীস। কোরান প্রকাশ্য আর হাদীস গোপনীয় ওহী। এর অর্থ নবী মোহাম্মদ নিজে থেকে কখনও কিছু বলেননি। যা বলেছেন আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েই বলেছেন, সেই অর্থে কোরান ও হাদীসের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য যে-টুকু তা হল কোরানের অর্থ ও ভাষা (text) উভয়ই অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর ওহী দ্বারা অবতীর্ণ। কোরান হল 'ওহী মতলু' বা আল্লাহর কালাম। কিন্তু হাদীসের অর্থ ও বিষয়বস্তু আল্লাহর ওহী দ্বারা প্রাপ্ত বটে। কিন্তু ইহার শব্দ ও বাক্য রসুলের রচিত। কোরান ও হাদীসের আসল উৎস একই। তাই মুসলমানদের কাছে হাদীসের মর্যাদা কোরানের পরেই।

রসুল আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাবার জন্যে সাহাবাদের সাথে কথা বলতেন। নিজের কথার সাহায্যে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা, তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতেন। নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের বিশ্লেষণ করতেন। এইজন্যে তা 'হাদীস' নামে অভিহিত হয়েছে। এককথায় রসুলের কথা, কাজের বিবরণ ও সমর্থন অনুমোদনকেই হাদীস বলা হয়। হাদীস একটি আভিধানিক শব্দমাত্র নয়। মূলত এটা ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। হাদীস আল্লাহর রসুলের বাণী, উপদেশ ও কার্যাবলীর নির্দেশ হলেও তার কোনও লিখিত সংকলন ছিল না। (সূত্র : হাদীস সাহিত্যের ইতিহাস—সা'দউল্লাহ)

অনেক ইসলামী পণ্ডিত দাবি করেন রসুল পরিষ্কারভাবে তাঁর সহচরদের নিষেধ করে গেছেন—একমাত্র আল্লাহর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত কোরান ছাড়া ধর্মের নামে আর কিছু যেন লিখে রাখা না হয়। যে নিষেধাজ্ঞার আওতায় তাঁর বাণী, কার্যাবলী এবং বিচারপদ্ধতির লিখিতরূপও পড়ে। ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা দাবী করেন রসুল যেভাবে কোরানের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন, যদি তিনি সেভাবে তাঁর বাণী উপদেশ এবং কোরানের ব্যাখ্যাও লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন, তা কোরানের সাথে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় তিনি তা নিষেধ করেছিলেন,

> আমার উপস্থাপিত বিধানসমূহের মধ্য থেকে পবিত্র কোরান ভিন্ন অন্যকিছু লিপিবদ্ধ করবে না।—সহীহ মুসলিম (সূত্র : হাদীস সাহিত্যের ইতিহাস—সা'দউল্লাহ)

ইসলামী চিন্তাবিদরা মনে করেন রসুল চেয়েছিলেন তাঁর অনুগামীরা পরিচালিত হবেন শুধু

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

কোরানের জ্ঞান এবং নিজের বিবেক দ্বারা। যে বিবেক আল্লাহ দান করেছেন প্রতিটি মুসলমানকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোনও হাদীস সংকলিত করা হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফা চতুষ্টয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু হাদীস লিখে রাখলেও পরে তা বিনষ্ট করে দেন। তাদেরও আশংকা ছিল হাদীসকে লিখিতরূপ দিলে তা কোরানের সাথে মিশে যেতে পারে। খলিফা ওমর সকল অধিকৃত রাজ্যে লিখিত ফরমান জারি করেছিলেন—"যদি কারো নিকট কোন হাদীস লিখিত অবস্থায় থাকে তা যেন মুছে ফেলেন।"

[সূত্রঃ মহানবীর (সাঃ) জীবনচরিত্র—অনুবাদ, মাওলানা আবদুল আওয়াল, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮]

হাদীসকে লিখিতরূপে না দেওয়ার জন্যে রসুল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সা'দউল্লাহর 'হাদীস সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে।

তবুও হাদীস সংকলিত হয়েছে।

কোরানের পরেই ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হল হাদীস। রসুল তাঁর ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং রাষ্ট্রপরিচালনার পটভূমিতে যেসব নির্দেশ-উপদেশ দিয়েছেন তার সংকলন হল হাদীস। রসুলের নির্দেশ ছাড়াও হাদীসে রয়েছে রাষ্ট্রপরিচালনার অজস্র উদাহরণ এবং সমকালীন ঘটনার বিবরণ। মোহাম্মদের পত্নীগণ এবং অনুচর সাহাবারা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ছয়টি হাদীস সংকলনকে বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীসের মর্যাদা দেওয়া হয়। যাদের বলা হয় 'সিহাহ সিত্তা'।

"সিহাহ সিত্তা" বলতে হাদিসের ছয়খানা 'বিশুদ্ধ' সঙ্কলিত গ্রন্থকে বোঝায়। এই গ্রন্থগুলো দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে (হিঃ) সঙ্কলিত হয়েছিল। এইসব বিশুদ্ধ হাদীস-সঙ্কলিত গ্রন্থগুলো হল :

(১) সহীহ বোখারী, রচনা করেছেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (হিঃ ১৯৪-২৫৬),

(২) সহীহ মুসলিম, রচনা করেছেন আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাত আল কোসায়রী (হিঃ ২০৪-২৬১),

(৩) সহীহ নাসায়ী, রচনা করেছেন আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়েব আননাসায়ী (হিঃ ২১৫-৩০৩);

(৪) সহীহ তিরমিযী, রচনা করেছেন আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আততিরমিযী (হিঃ ২০২-২৭১);

(৫) সহীহ আবু দাউদ, রচনা করেছেন আবু দাউদ সোলায়মান ইবনে আশ আস সিজেসতানী (হিঃ ২০৪-২৭৫) এবং

(৬) সহীহ ইবনে মাজা, রচনা করেছেন আবু আবদুলল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজা কায়বেনী (হিঃ ২০৩-২৭৯)।

উপরোক্ত হাদীসগুলো বিভিন্ন পর্ব ও অধ্যায় আকারে লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ বোখারী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বলে গণ্য। তাই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে "আল্লাহর কিতাব (কোরআন)-এর পরেই সহীহ বোখারী বিশুদ্ধতম কিতাব"। ইমাম বোখারী বলেন, "আমি এ সহীহ বোখারী শরীফ সুদীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ একটানা পরিশ্রম করে ছয় লাখ হাদীসের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার হাদীস সঙ্কলন করেছি, যা আমি আমার ও মহান আল্লাহর মধ্যে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছি।" (হাদীস সাহিত্যের ইতিহাস—সা'দউল্লাহ, পৃঃ ৪৪)

হাদীসের মর্যাদা এবং সংকলন নিয়ে প্রাথমিক একটা ধারণা দেওয়ার জন্যেই আমরা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাজনদের রচনা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরলাম। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হাদীসে নারীর অবস্থান তুলে ধরা, কোরানে আমরা নারীকে দেখেছি। হাদীসেও দেখতে চাই।

প্রথমে আমরা হাদীস-সম্রাট ইমাম বোখারীর সহীহ হাদীস থেকে কয়েকটি নির্বাচিত হাদীস তুলে ধরব। বলা যায় এ প্রচেষ্টা হল বিশাল হাদীস সমুদ্র থেকে কলসী করে কিছু জল তুলে নেওয়া। এই রচনায় এর আগেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা অনেক হাদীস চয়ন করেছি।

- পুরুষের পরে নারী অপেক্ষা ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রেখে যাচ্ছি না।
- যদি বিবি হাওয়া না হতেন তবে কখনো কোনও নারী স্বামীর ক্ষতি করত না।
- তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও। সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা বনি ইস্রাইলের প্রতি প্রথম যে বিপদ এসেছিল তা নারী জাতির ভিতর দিয়েই।
- পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

নারীকে বিশ্বাস না করার জন্যে কত সতর্কবাণী। নারী এখানে আর মানবীসত্তায় নেই। হয়ে উঠেছে দানবী। তাকে বিশ্বাস করলে তার ওপর নির্ভর করলে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। নারীকে বিশ্বাস করে আদিপিতা আদম বিপথে চালিত হয়ে আল্লার রোষানলে পড়ে জান্নাতভ্রষ্ট হন। বাইবেলে (কোরান-হাদীসেও এই কাহিনী রয়েছে) বর্ণিত স্বর্গ হতে পতনের সে কাহিনী নারীকে করে তুলেছে চির-অপরাধী। তাকে তুলে ধরেছে পুরুষের কীর্তি-সুখ-শান্তি ধ্বংসকারী রূপে। অথচ নারী না হলে তো সৃষ্টির রহস্যই উন্মোচিত হত না। নারী তো সৃষ্টির ধাত্রী।

বোখারী শরীফ থেকে আরো কিছু হাদীস—

- হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমার পরে দ্বীন-বিনষ্টকারী এবং মানুষকে বিপথগামী করার বহু সূত্রই সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর ক্ষতিসাধনকারী বস্তুসমূহের মধ্যে পুরুষদের জন্য নারীগণই হইবে সর্বাধিক ক্ষতিকারিনী— পুরুষদের জন্য নারীদের সমতুল্য পথভ্রষ্টকারী ক্ষতিকারক আর কোন কিছু হইবে না।
- নারী (জাতির মূল অর্থাৎ সর্বপ্রথম নারী—আদি-মাতা হাওয়া) পাঁজরের (ঊর্ধ্বতম) হাড় হইতে সৃষ্ট। পাঁজরের হাড়সমূহের মধ্যে ঊর্ধ্বতম হাড়খানাই সর্বাধিক বাঁকা।
- দোজখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে।
- স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার প্রতি ডাকে এবং স্ত্রী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে [illegible] স্বামী অসন্তুষ্টির সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছেন, তবে সেই স্ত্রীর রাত্রি এই অবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, ফেরেশতাগণ [illegible] তাহার প্রতি লানৎ (বা অভিশাপ) বর্ষণ করিয়া থাকেন।
- অকল্যাণ তিন জিনিসে—নারী, বাসস্থান ও পশুতে।

ইসলামে, রসুলের হাদীসে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। সেখানে কোনও শর্ত নেই। কিন্তু স্বামী স্ত্রী বা স্ত্রীদের প্রতি অনুগত হবে এমন কোনও হাদীস নেই, স্ত্রীকে যখন ডাক দেবে স্বামী শয্যায় তাকে আসতেই হবে যৌনমিলনের জন্যে। সেখানে স্ত্রী নামে বস্তুটির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য নেই। স্বামী স্ত্রী বা স্ত্রীদের ঘরে রেখে কোনও উপপত্নীতে উপগত হলেও স্বামীর ওপর কোনও লানত বর্ষণ হবে না। তেমন কোনও হাদীস আমাদের চোখে পড়েনি।

মহানবী মোহাম্মদকে দোজখ বা জাহান্নাম দেখানো হয়েছিল। সেখানে তিনি দেখেছেন দোজখীদের অধিকাংশ নারী। রোজ কিয়ামতের পূর্বে কাদের বিচার করা হল। আল্লাহ কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীদের দিয়ে দোজখ পূর্ণ করলেন তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা হাদীসে নেই। অনাগত যে কিয়ামত আসবে তার ও অনেক অনেক আগে আগে কী এই বিচিত্র দুনিয়ায় আরও একবার রোজ কিয়ামত নেমে এসেছিল তারও কোনও কথা নেই কোরানে হাদীসে। তবে কী রসুল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আগামী কিয়ামতের পরের ছবি দেখেছিলেন। রসুল মোহাম্মদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল নারীরা কেন এত বেশী সংখ্যায় দোজখে যাবে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন নারীরা যে 'কুফরী' বেশী করে থাকে তা হল স্বামীর কুফরী (নাশোকরী ও নেমকহারামী)। নারীর স্বভাবই হল এই কুফরী করা। এখানেও সেই স্বামী নামে প্রভুর আনুগত্যের প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে।

(সূত্র : বোখারী শরীফ, অনুবাদ-মাওলানা আজিজুল হক)

বোখারী শরীফ থেকে আরো কিছু নির্বাচিত হাদীস—

- নারী জাতি আড়ালে থাকার বস্তু। আড়াল হতে নারী বের হলেই শয়তান তাদের প্রতি উঁকি মারে। এই জন্যেই নারীর নাম হল আওরত বা আবরণীয় জিনিস।
- নারী শয়তানের ফাঁদ।
- নারী শয়তানের আকৃতিতে সামনে আসে এবং শয়তানের আকৃতিতে চলে যায়।

নারী তো শুধু দয়িতা নয়। মাতা-কন্যা-ভগ্নীও, তারাও কী পুত্র-পিতা ও ভ্রাতার কাছে শয়তানের রূপ ধরে আসে? এই প্রশ্নের উত্তর কোথায় খুঁজি। এই সব হাদীসে নারীর প্রতি অসম্মান চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। নারী বেগানা পুরুষের সামনে আসলেই শয়তান তার ওপর ভর করে এবং শয়তানের আকৃতি পেয়ে যায় সেই নারী, তারপর যদি সেই নারী আড়ালেও চলে যায়, শয়তানের আকৃতির রেখাপাত রেখে দেয় সেই পুরুষের হৃদয় পটে। তাই সব দিকে আবড়িত করে ঘরে বন্দী করে রাখতেই হয় নারীকে। সেটাই উত্তম কাজ। নারীকে শয়তানের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার এ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। এটাও এক ব্যাখ্যা হাদীসের। অনুরূপ বোখারী হাদীসে রসুল বলেছেন—

- স্বামীর অনুপস্থিতিতে নারীদের কাছে যেও না। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত চলাচলের পথে চলতে সক্ষম।
- একাকী কোনও নারীর সঙ্গে দেখা হলেই শয়তান তাদের তৃতীয় জন হয়।

শয়তান কী শুধু নারীকেই দেখে? পুরুষকে দেখে না। দেখার কথা নয়। কারণ শয়তানও আল্লার সৃষ্টি আরেক পুরুষ, তারও প্রয়োজন নারীর। নারীর সাথে তার জন্মবিরোধ। সেটাই হয়তো আরেক ব্যাখ্যা নারী ও শয়তানের সম্পর্কের।

বোখারী শরীফ ছাড়া অন্য সহীহ হাদীস-মুসলিম, তিরমিজি ও মিশকাত শরীফ থেকেও কিছু নির্বাচিত হাদীস তুলে ধরা যায়—

- 'দুনিয়ার সবকিছু ভোগের সামগ্রী আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী নেক্ চরিত্রের স্ত্রী।'
- 'যদি আমি কাহাকেও সেজদা করিতে হুকুম করিতাম তবে নিশ্চয় সকল নারীকে হুকুম করিতাম তাহারা যেন তাহাদের স্বামীকে সেজদা করে।'
- 'তিন ব্যক্তির নামাজ বন্দেগী কিছুই কবুল হইবে না — (১) যে গোলাম মনিবের নিকট হইতে পালাইয়া গিয়াছে, সে মনিবের নিকট হাজির না হওয়া পর্যন্ত। (২) যে স্ত্রীর স্বামী তাহার উপর অসন্তুষ্ট, সে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত। (৩) নেশাখোর নেশা ছাড়িয়া না দেওয়া পর্যন্ত।'
- 'যদি কোনো ব্যক্তি সঙ্গম করিবার ইচ্ছায় স্ত্রীকে আহ্বান করে তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হয়—যদিও সে উনানের উপর (রন্ধনের কাজে লিপ্ত) থাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- 'যদি কোনো পুরুষের শরীর হইতে সর্বদা পুঁজ-রক্ত বাহির হইতে থাকে, আর তাহার স্ত্রী ঐ সমস্ত পুঁজ রক্ত নিজের জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া সাফ করিয়া দেয়, তথাপি পুরুষের হক আদায় হইবে না।'
- 'যে স্ত্রীরা সর্বদা স্বামীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা করে, স্বামীর হক আদায় করতে থাকে, স্বামীর সন্তোষ তলব করে ও স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী তাহার পায়রবি করে তবে সেই স্ত্রীরা পুরুষের জুম্মা, জামাত, হজ্জ ও ওমরার তুল্য সওয়াব পাইবে।'
- 'যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করিয়া ছবর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আল্লাহ শহীদের তুল্য সওয়াব দান করিবেন।'
- 'যখন কোনো স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিবে যে, তোমার কোনো কার্যই আমার পছন্দ হইতেছে না, তখনই তাহার ৭০ বছরের এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে। যদিও সে দিবসে রোজা রাখিয়া ও রাত্রে নামাজ পড়িয়া ৭০ বছরের পুণ্য কামাই করিয়াছিল।'
- 'বেহেশতবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরও আশি হাজার দাস এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকিবে।'
- 'যদি স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করে, তবে সে জরদ পর্বত হইতে কালো পর্বতের দিকে এবং কালো পর্বত হইতে শাদা পর্বতের দিকে ধাবিত হোক, তথাপি সেই আদেশ প্রতিপালন করা তাহার কর্তব্য।'
- 'যখন কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তাহার শয্যার দিকে আহ্বান করে এবং স্ত্রী সেই আহ্বানে সাড়া না দেবার জন্য যদি স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করিয়া থাকে, তবে প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীলোকের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকেন।'
- 'স্বামী তাহার স্ত্রীকে চারটি কারণে প্রহার করিতে পারে, (১) স্ত্রীকে সাজসজ্জা করিয়া তাহার নিকট আসিতে বলার পর স্ত্রী তাহা অমান্য করিলে (২) সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামীর আহ্বান পাওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করিলে। (৩) স্ত্রী ফরজ গোসল ও নামাজ পরিত্যাগ করিলে। (৪) স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাহারো বাড়িতে বেড়াইতে গেলে।'
- নারীজাতি সৃষ্টিগতভাবেই একটু বক্র স্বভাবের—তাহাকে বাঁকা থাকিতে দিয়াই তাহার সহিত তোমার জীবন নির্বাহ করিতে হইবে।
- নারী তোমার মত মোতাবেক পূর্ণ সোজা হইয়া চলিবে না। অতএব উহার দ্বারা উপকৃত হইতে চাহিলে উহার (স্বভাবের) বক্রতাবস্তায়ই তাহা হইতে নিজের উপকার উদ্ধার করিও। যদি উহাকে সোজা রাখিতে চেষ্টা কর তবে তুমি উহাকে ভাঙিয়া ফেলিবে।

আর একটি হাদীস—

- কোনও নারী অথবা কুকুর যদি নামাজরত অবস্থায় সম্মুখ দিয়ে যায় তাহলে তার এবাদত আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না। (বোখারী শরীফ - ৩১৬)

অনেক হাদীসে কুকুরের সাথে গাধাকেও যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রসুলপত্নী আয়েশা, যিনি নিজে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছিলেন রসুলের মৃত্যুর পর, বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই হাদীসে। তিনি রসুলের ঘনিষ্ঠ সাহাবাদের কাছে বলেছিলেন, "আপনারা আমাদের গাধা ও কুকুরের সমপর্যায়ে নামিয়ে দিলেন" (you have put us on the same level with a donkey and a dog.)। কুকুর হল ইসলামে সবচেয়ে নাপাক (অপবিত্র) জীব। বোখারী শরীফে একটি হাদীসে আছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- কুকুর যদি কোনও পাত্রে মুখ দেয় তবে সেই পাত্র সাতবার ধুয়ে নেবে।

সহীহ মুসলিম শরীফে আরো আছে—

- অষ্টমবার মাটি দ্বারা মর্দন করে ধুয়ে নেবে।

এই হল কুকুর। এর সাথে তুলনা করা হয়েছে নারীর। আর এই হল নারীর জন্যে হাদীসের বিধান।

বোখারী শরীফে এই হাদীসের ব্যাখ্যা আছে। ইসলামের বিশিষ্ট ইমামগণ মনে করেন নামাজরত পুরুষের সামনে দিয়ে নারী গেলে নামাজে তার একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। তাই তার এবাদত বাতিল হয়ে যায়। কারণ স্বভাবগত ভাবে নারীর ওপর দুর্বলতা রয়েছে পুরুষের। তাই নামাজরত অবস্থায়ও তার চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিতে পারে, তাই এই সাবধানতা। গাধা ও কুকুরের সাথে রয়েছে শয়তানের বিশেষ সংশ্রব। তাই এই তিন প্রাণীকে নামাজ আরম্ভ করবার পূর্বে এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে এই হাদীসে। (বোখারী শরীফ - ৩১৬)

কুকুর ও গাধার কথা থাকুক। যে চিত্তচাঞ্চল্য নামাজরত পুরুষের হতে পারে নারীকে দেখলে তা কি নামাজরতা নারীর হতে পারে না পুরুষ সম্মুখ দিয়ে গেলে? কিন্তু পুরুষের জন্যে তেমন কোনও হাদীস নেই।

নারীকে অবরোধে রাখা প্রসঙ্গে কোরানের আয়াত এবং রসুলের নির্দেশ আমরা তুলে ধরেছি। সেই অবরোধের নমুনা আমরা তুলে ধরতে চাই বোখারী শরীফ থেকে।

পর্দার বা অবরোধের বিধানে যে যে অঙ্গ নারীকে ঢেকে রাখতে হবে তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে বোখারী শরীফে। তাকে বলা হচ্ছে 'ছতর' বা 'সতর'। নারীদের দেহ ঢেকে রাখা সম্পর্কে দুটি নির্দেশ রয়েছে। প্রথম হল সতর। অন্যটি হেজাব বা পর্দা। সতরের পরে হেজাব। সতরের অঙ্গ ও সীমা কেউ না দেখলেও আবৃত রাখতে হবে। তাছাড়া সতরের সীমা ও অঙ্গ সমূহ আবৃত রাখা নামাজের একটি অবশ্য ফরজ নারীর জন্যে। যা অবশ্য পালনীয়। পক্ষান্তরে পর্দা বা হেজাবের অঙ্গ শুধুমাত্র দর্শক হতে আবৃত রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ ঘরের ভেতর অবরোধে থাকাকালীন হেজাব না পরলেও চলতে পারে।

নারীদের সতর যে অঙ্গসমূহ :

• উভয় উরু হাঁটুসহ, • উভয় পায়ের গোছা গিঁঠদ্বয় সহ, • উভয় নিতম্ব, • জননেন্দ্রিয়, আশ-পাশ সহ, • গুহ্য বা মলদ্বার, আশ-পাশ সহ, • পেট ও পিঠ, উভয় পার্শ্ব সহ, • উভয় স্তন, • মাথা • চুল • উভয় কান • ঘাড় • উভয় কাঁধ • উভয় বাহু কনুইর গিঁঠ সহ • উভয় হাত কব্জি ভিন্ন কিন্তু কব্জির গিঁট সহ।

বর্ণিত অঙ্গগুলি হল নারীদের জন্যে সতর। অবশিষ্ট যে পাঁচটি অঙ্গ • মুখ মন্ডল • উভয় হাতের কব্জি এবং • উভয় পায়ের পাতা সতরের শামিল নয়। এই অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়।

যে অঙ্গসমূহ নারীকে সর্ব অবস্থায় ঢেকে রাখবে হবে তার তালিকা আমরা দেখে নিলাম। বহিরঙ্গের এত কিছু ঢেকে নারী কী ভাবে চলাফেরা করবে। এরপর ঢাকার তো আর কিছু থাকে না যা দিয়ে শয়তান ঢুকে পড়বে তার শরীরে, সে দেখবেই বা কী! এখানেই শেষ নয়। আরো আছে হেজাব বা বোরখা। যা নারীকে অবশ্যই পরতে হবে অন্দর থেকে বাইরে গেলে। বোরখার সীমানা নারীর সম্পূর্ণ দেহ। হেজাবের বিধানে হাত-মুখ ইত্যাদি নারী দেহের অঙ্গসমূহের মধ্যে কোনও তারতম্য নেই। অর্থাৎ সর্ব অঙ্গ আবরিত করে নিজকে চলমান জড়বস্তুতে পরিণত করেই নারী শুধু বাইরে যেতে পারে। এই নারীকে চেনা যাবে না। তার প্রয়োজনও নেই। নারীর নিজস্ব

পরিচয় যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে তার জন্যেই এত আয়োজন। সতরে আর হেজাবে আবদ্ধ হয়ে নারী তো ভাল করে চলতেও পারবে না। নারীর তো চলার দরকার নেই বাইরের জগতে। তাকে শুধু অন্দরে আপন পুরুষদের সামনে চলতে পারলেই হবে। অন্দরের বাইরে নারী শুধু আসবে জরুরী প্রয়োজনে। ভূমিকম্পে অথবা প্রলয়ে। নারীর এই রূপ দেখা গেছে রসুলের মর্ত্যের লীলাভূমি সউদী আরবে (এখনো দেখা যায়), তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনী শাসিত ইরানে। আরও অনেক দেশে। হেজাব বা বোরখা ছাড়া শুধুমাত্র সেইসব পুরুষদের সামনে আসা যাবে যারা হলেন 'মাহরম' অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহবন্ধন চিরকালের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে কোরান। তাদের বেলায়ও সতরের নিষেধ থাকবে। শুধু হেজাব না পরলেও চলবে। নবী পত্নীদের বেলা প্রথম এই নিষেধবিধি প্রয়োগ করা হয়।

> নবির স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতা, ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, পরিচারিকা ও তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের ক্ষেত্রে এ (পরদা) না মানলে কোনো দোষ নেই, হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও বিশ্বাসী নারীদের বলো তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখের ওপর টেনে দেয়। —সুরা নিসা, ৩৩/৫৫, ৫৯

আল্লাহ বলেছেন নবীর পত্নীরা হলেন মুসলমানদের মাতৃসমা। উম্মুল মোমেনীন। তাদের সামনেও পর্দার এই যে নির্দেশ তা মাতা আর সন্তানের সম্পর্ককে ম্লান করে দেয়। মুসলমান পুরুষ নবী পত্নীদের কাছে পরপুরুষ হলেও তারা পুত্রতুল্য। সেই পবিত্র সম্পর্কে শয়তান কোন্ পথ দিয়ে ঢুকবে, কেনই বা ঢুকবে আমরা তা বুঝতে পারি না।

ইসলাম নারীকে সর্বঅঙ্গ ঢেকে বস্তুতে পরিণত হতে নির্দেশ দিল। নবী-পত্নীরাও সেই নির্দেশ পালন করে গেছেন। রসুলের ইচ্ছা ছিল তাই। কিন্তু পুরুষের দেহ ঢাকা সম্বন্ধে হাদীসের শুধু একটি বিধান। তা হল 'পুরুষদের সতর নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা'। আর কোনও অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়।

এই হল হাদীসের নারী।

AMARBOI.COM

আল্লাহর পরোক্ষ ওহী হল হাদীস। রসুলের ওপর পরোক্ষে অবতীর্ণ সেই ওহী নারীকে যেন আরো শৃঙ্খলিত করেছে। কোরানে নারী পুরুষের অধীন। পুরুষের কর্তৃত্ব সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। হাদীসেও তাই। এখানে নারীর স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও স্থান নেই। তার স্বাধীনতা, তার ব্যক্তিত্ব এখানে স্বীকৃত নয়। নারীর রুচি, বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ এখানে অবৈধ বলে বিবেচিত। যত রকম অবরোধ শুধু নারীর জন্যে। পুরুষের জন্যে কিছুই নয়, এখানে সব কিছুতেই চূড়ান্ত অসাম্য। নারীর অধিকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইসলামী পণ্ডিত ও তফসিরকাররা কোরানের অনেক আয়াতে এবং রসুলের হাদীসে নারীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন এই বলে নারী শারিরীকভাবে দুর্বলতর। তাছাড়া তার বাস্তব কিছু অসুবিধাও রয়েছে বলে মনে করেন তাঁরা। নারী শক্তিমত্তায় দুর্বল বা মাসে একবার ঋতুমতী হয় বলে সে অনেক কাজের অযোগ্য এমন প্রমাণ কোনও কালেই ছিল না। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরান-হাদীস : নারীর বিচার

ইসলামের বিচারালয়ে নারীকে কখনো পূর্ণ মানুষ রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। নারীকে বিবেচনা করা হয় পুরুষের অর্দ্ধেক বলে। দুজন নারী মিলে একজন পুরুষের সমকক্ষ হওয়া যায়। কোনও বিচারে সাক্ষ্য দিতে হলে যেখানে একজন পুরুষ হলে চলতে পারে যেখানে প্রয়োজন হবে দুজন নারীর। এ থেকেই ইসলামের বিচারব্যবস্থায় নারীর অবস্থা ও অবস্থান দুটোই বুঝে নেওয়া যায়।

> আর তোমাদের পছন্দমতো দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক। —সুরা বাকারা, ২/২৮২

বোখারী শরীফে রয়েছে—

> তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী সংগ্রহ করতে হবে। যদি দুজন পুরুষ না থাকে একজন পুরুষ ও দুজন নারী হলে হবে।

কোরানের প্রতিধ্বনি হাদীসে। কোরানের এই আয়াত ও এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে নারীর রয়েছে সৃষ্টিগত দুর্বলতা। তাই আল্লাহ নারীর ওপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর কোনও ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পাইনি। এই শ্রেষ্ঠত্ব থেকেই নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের অর্দ্ধেক। সে সম্পত্তির অধিকার পেলেও, পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র কারো সম্পত্তিতেই পুরুষের সমান অধিকার পায় না। পায় পুরুষের অর্দ্ধাংশ।

কোরানের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী আইনব্যবস্থায় যে আইনসমূহ গড়ে উঠেছে তা হল শরীয়া। কোরানের প্রতিটি শব্দ চিরন্তনভাবে সত্য বলে নিয়েই শরীয়ার সৃষ্টি, সুন্নাহ হল রসুলের বাণীও কার্যাবলী সংক্রান্ত বিধান যা সংকলিত হয়েছে হাদীসে। যদিও হাদীস পূর্ণাঙ্গরূপে সংকলিত হয়েছে রসুলের মৃত্যুর দুইশত বছর পরে। সুন্নাহ হল রসুলের উম্মতের প্রতি তাঁর উত্তরাধিকার। সুন্নাহ হল হাদীসের প্রায়োগিক নির্দেশ। কোরানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শরীয়া অপরিবর্তনীয়। কোরান-হাদীস-শরীয়া-সুন্নাহ এই হল ইসলামী আইনের নিজস্ব শব্দ। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় কোরান-হাদীসের নির্দেশ মেনে শরীয়া-সুন্নাহকে অবলম্বন করে বিচারক রায় দেন।

শরীয়তি আইনে 'জেনা'র জন্যে চরম শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ব্যাভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলন, ধর্ষণ ও পতিতাবৃত্তিকে জেনা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পরস্পরের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কোনও চুক্তি নেই এমন দুজন নরনারীর যৌনমিলন হল জেনা। শরিয়তী আইনে জেনা বা ব্যভিচারের জন্যে চরম শাস্তির বিধান রাখা হলেও নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে শাস্তি দুরকম। জেনার জন্যে অবিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে তা ১০০ ঘা বেত্রদণ্ড বিবাহিত পুরষের ক্ষেত্রে ৮০ ঘা বেত্রদণ্ড। কিন্তু নারীর বেলায় এই শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। অপরাধ প্রমাণ করতে চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কোনও ভাবেই নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। এই প্রসঙ্গে কোরানের এই আয়াতটি স্মরণীয়—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নেবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে ঘরে আটকে করবে। যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

—সুরা নিসা, ৪/১৫

পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে আটক রাখার নির্দেশ কোরানের কোনও আয়াতে নেই। পুরুষ যেন ব্যাভিচার করতেই পারে না যদি না নারী তাকে প্রলুব্ধ করে। কারণ হাদীসের ভাষায় শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দেয় নারী পুরুষ নয়। অথচ নারী প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হচ্ছে। ইসলামের স্বর্ণযুগেও তার কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। নারীর জন্যে আপাতত যা ব্যভিচার মনে হয়, তা যে অনেক সময় ধর্ষণ সেই সত্যটা ইসলামী বিচারব্যবস্থা যেন স্বীকারই করতে চায় না। কিন্তু ধর্ষণের মত যৌনাপরাধ প্রমাণ করতেও চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এটা কোনও ভাবেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে কোনও পুরুষ-অন্য চারজন পুরুষের সামনে এই জঘন্য যৌনাপরাধ করবে। যদি তেমন ঘটনা ঘটেও থাকে তাহলে সেই চারজন পুরুষেরও ধর্ষকের দলে থাকার কথা। তারা কখনো বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেবে না পরে, কিন্তু একজন পুরুষ জন্য চারজন নারীর সামনে পঞ্চম কোনও নারীকে ধর্ষণ করেছে এমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু শরীয়তী আইনে ওরা অপরাধীর বিচারের জন্যে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকারী নয়। এই শর্ত অপরাধীকে রক্ষা করে আর আক্রান্ত নারীকে করে সুবিচার থেকে বঞ্চিত। আইন ধর্ষিতাকে মৃত্যুদণ্ড আর ধর্ষককে দেয় রেহাই। সামান্য কয়েক ঘা বেত ছাড়া কোনও শাস্তি নয় ধর্ষক পুরুষের জন্যে। সমাজে যৌন অপরাধ কেউ সাক্ষী রেখে করেনা। তাই এই শরীয়তি বিধান ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় নারীর প্রতি চরম বৈষম্যের নামান্তর।

নারীর প্রতি এই লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ নিয়ে কোরান ও হাদীসের বিভিন্ন তফসিরকাররা যে ব্যাখ্যা তুলে ধরেন, তার মূল কথাগুলি হল, নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ—তাদের বুঝবার ক্ষমতা কম। স্মরণশক্তি কম ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম। যেন নারীরা চোখের সামনে কোনও ঘটনা ঘটতে দেখলেও তা মনে করতে বা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। নারী সম্বন্ধে এই হল ইসলামের মূল্যায়ন। তাছাড়া ইসলামে দাস ও দাসীর মত যে ব্যক্তি অন্য কারও সম্পত্তি তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে। নারী ক্রীতদাসী না হলেও দাসী সমতুল্যা। তার প্রথম প্রভু আল্লাহ হলেও দ্বিতীয় প্রভু পুরুষ। নারী তো কোনও অবস্থাতেই স্বাধীন মানুষ নয়। সদর এবং হেজাব পরে, যা তার নিয়তি নির্দ্ধারিত, সে যখন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেবে বিচারকের তো তাকে চিনতে পারার কথা নয়। তার সাক্ষ্য নেবেন কী করে বিচারক। তাছাড়া বিচারকও একজন পুরুষ। বলা যায় ইসলামী পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের তিনিও দাবিদার। শরীয়া আইনে নারী তো কোনদিন বিচারক হতে পারেন না। সেটা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর আঘাত। নারী কী করে বিচার করবে পুরুষের। ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় নারীর সুবিচার প্রাপ্তি যতটা প্রচারিত বাস্তবে তা নয়। মুসলিম দেশে দেশে শরীয়া আইনের প্রয়োগের নমুনা দেখেই তা বুঝা যায়। আমরা তা নিয়ে কোনও আলোচনায় যাব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম : নারী ও পুরুষতন্ত্র

আরব জগতে ইসলাম-পূর্ব যুগে নারী ছিল সবদিক থেকে নিগৃহীতা ও বঞ্চিতা— এই কথাটি ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে প্রচারিত। ইসলামের আবির্ভাবে সেই নারী মুক্তি পেয়েছে, সপ্তম শতকেই আরবে প্রথম নারী সামাজিক অধিকার পেয়েছে ইসলামের আগমনে — এসব কথা যে সত্য নয় তা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, ইসলামের একমাত্র এবং পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ কোরান থেকে অনেক আয়াত উদ্ধৃত করে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদের মহান উত্তরাধিকার যে হাদীস, যার মর্যাদা ইসলামে কোরানের পরেই তা থেকেও আমরা কিছু নির্বাচিত হাদীস তুলে ধরে দেখিয়েছি সব হাদীস নারীর জন্যে নয়। কোরানের অনেক আয়াত এবং রসুলের অনেক হাদীস তো নারীর জন্যে রীতিমতো অসম্মানের। তার অর্থ এ নয় যে সম্পূর্ণ কোরান ও হাদীসে নারীর পক্ষে কোনও নির্দেশ, উপদেশ, বিধি-বিধান নেই। আমরা তা বলতে চাইনি। কিন্তু যে সব আয়াত বা হাদীস নারীর প্রতিকূলে তা উপেক্ষা করার মত নয়। সব ধর্মের ধর্ম গ্রন্থেই নারীর পক্ষে কিছু অমূল্য সুন্দর সুন্দর কথা থাকে, কিন্তু তার আড়ালে যা থাকে তা গরল। একটু নাড়া দিলেই তা বেড়িয়ে পড়ে। কোনও ধর্মেই নারীকে তার নিজের জীবন নির্ধারণ করার অধিকার দেওয়া হয়নি। ইসলাম যে দাবি করে এই ধর্ম নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে সেই দাবি ভিত্তিহীন। ইসলাম নারীর জন্যে যতই কল্যাণজনক কিছু বিধি-বিধান তৈরি করুক তাও করেছে পুরুষের সুবিধের জন্যে। নারীর জন্যে নয়। সব ধর্মের মত ইসলামও পুরুষের হাতে পুরুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট। অন্য কোনও কোনও ধর্মে তবু দেবী-বন্দনার নামে নারী-বন্দনা আছে। নারীও বন্দনার যোগ্য সেটা ধর্ম তাদের মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয়। ইসলামে সেই সুযোগও নেই। ইসলাম কোনও অবস্থায় নারীকে বন্দনার যোগ্য মনে করে না। সেই ধর্ম সগর্বে ঘোষণা করেছে নারীর ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলাম একেবারে নির্ভেজাল পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম। তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে কোরানে, হাদীসে, রসুলের ব্যক্তিজীবনে। রসুল হজরত মোহাম্মদ হলেন আল্লাহর পর দ্বিতীয় পুরুষ। কিন্তু প্রথম পুরুষ এই মর্ত্যভূমিতে। আল্লাহ তো অদৃশ্য। মোহাম্মদ মুসলমানদের কাছে অনুসরণের শেষসীমা। তাঁর জীবন হল উৎকর্ষের চূড়ান্ত রূপ। আল্লাহর কোরান ও রসুলের হাদীস তাই আলাদা নয়। একটা জায়গায় তারা অভেদ। সেটা পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

শতবর্ষ পূর্বে বাংলার এক মুসলমান নারী মহিয়সী বেগম রোকেয়া ঘোষণা করেছিলেন—

> "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ এই ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" পিতৃতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নারী সরাসরি বাতিল করে দেন কোনো বিশেষ একটি ধর্মগ্রন্থকে নয়। সমস্ত ধর্মগ্রন্থকে; ধর্মগ্রন্থের পেছনের সত্যকে প্রকাশ করেন অকপটে। (রোকেয়া রচনাবলী, সম্পাদকের নিবেদন)

আমাদের দুর্ভাগ্য [illegible] হওয়ার পর, [illegible] কখনও মাথা তুলিতে পারি

www.amarboi.com

নাই;..যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।...আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। এখন ত অবস্থা এই যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই শুনিতে পাস: 'প্যাট্! তুই জন্মেছিস গোলাম, থাক্‌বি গোলাম!' সুতরাং আমাদের আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া যায়।...

আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে: 'ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক।' মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।...

আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...

এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুণির বিধান হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কি না, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না।...এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।...

'ধর্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। (রোকেয়া রচনাবলী।)

হুমায়ুন আজাদ মনে করেন "রোকেয়া কোনো ধর্মকে বাতিল করেননি, বাতিল করেছেন সব ধর্মকেই।" রোকেয়া ছিলেন মুসলিম নারী। তাই পুরুষতান্ত্রিক সব ধর্মকে বাতিল করলেও ইসলাম সম্পর্কেই এত কথা বলেছেন। সেকথা বুঝে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না আমাদের। ইসলামের পুরুষতান্ত্রিক রূপ অনেক কাছে থেকে দেখেছেন তিনি। সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। সব ধর্মের কথা না বলে শুধু ইসলামের নির্দেশ-বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করলে সেদিনের মুসলমান সমাজ সহ্য করত না। এখনও করে না। ইসলামের পুরুষতন্ত্র ধর্মের কোনও সমালোচনা সহ্য করে না। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই সেই অসহিষ্ণুতার ধারা বহমান।

ইসলাম সম্পূর্ণরূপে পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম। আমরা হুমায়ুন আজাদের 'নারী' গ্রন্থ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি। সব কথা তাঁর নিজেরও নয়।

ইসলামে নারী 'ফিৎনা' বা বিশৃঙ্খলা, যে তার কাম দিয়ে বিপর্যয় করে সমাজ; তাই তাকে অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে হবে অবরোধে। ফাতিমা মেরনিস্‌নির (১৯৭৫, ৩৪) মতে নারীপুরুষ সম্পর্কে ইসলামি সমাজে রয়েছে দুটি তত্ত্ব, একটি স্পষ্ট, আরেকটি অন্তর্নিহিত : স্পষ্ট তত্ত্বটি হচ্ছে নারীর কাম অসীম। অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির চূড়ান্ত রূপ মেলে ইমাম গাজ্জালির *ইহয়া উলুম আল-দিন* বা *ধর্মতত্ত্বের পুনরুজ্জীবন*-এ। তাঁর মতে সভ্যতা নিরন্তর সংগ্রাম ক'রে চলছে নারীর সর্বগ্রাসী সর্বনাশী শক্তির সাথে; তাই পুরুষ যাতে অবিচলিতভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্যে দরকার নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা। সমাজ টিকে থাকতে পারে এমন সব সংস্থা তৈরি ক'রে, যেগুলোর কাজ নারীকে অবরুদ্ধ ও পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থা ক'রে পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। নারীপুরুষ সম্পর্কে ইসলামি স্পষ্ট তত্ত্বটি হচ্ছে পুরুষ নারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে শ্রেষ্ঠ; পুরুষের প্রবণতা জয়লাভ ও আধিপত্য করা; নারীর প্রবণতা পরাভূত অধীনস্থ হওয়া।

এখানে ফাতিমা মেরনিসনির কথা যেমন আছে তেমনি আছে ইমাম গাজ্জালীর কথাও। ফাতিমা মেরনিসনিকে উপেক্ষা করলেও ইমাম গাজ্জালীকে উপেক্ষা করব কোন্ সাহসে।

রসুল হজরত মোহাম্মদ তাঁর উম্মতের জন্যে যে মহৎ উত্তরাধিকার রেখে গেলেন সেখানে নারীর স্থান একেবারেই গৌণ। তিনি শুধু নবধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না—ছিলেন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। সব ক্ষমতা তখন তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। বিবি খাদিজার পরে যখন তিনি বহুপত্নীক হলেন তাঁর পত্নীদের মধ্যে কোন নারীকে তাঁর পরামর্শদাতা রূপে দেখা যায় না। ইতিহাসে অন্তত কারো নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি আরবের বহুবিবাহ প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কোরানে-হাদীসে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন সেই প্রথা, নিজে প্রচলন করে গেছেন এক হারেমের। সেখানে তাঁর অনেক পত্নী, উপপত্নীও। সেই যে ধারা তা থেকে পরবর্তীকালের খলিফা ও শাসনকর্তারা মুক্ত হতে পারেননি। নারী তাদের কাছে ছিল অধিকারের বস্তু। যুদ্ধ জয়ে লব্ধ সম্পত্তি। মুসলমান শাসনকর্তাদের হারেমের গল্প-কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। কোরান রসুলের বিধবা পত্নীদের পুনর্বিবাহ বন্ধ করে দিয়ে তাদের একটা বড় অধিকার হরণ করে নিয়েছেন। তাঁরা উম্মুল মুমেনীন। মুসলমানদের মাতৃরূপা। এই সান্ত্বনায় কী তাঁরা তৃপ্ত ছিলেন কে বলবে সে কথা।

ইসলাম নারীকে গৃহকোণে অবরুদ্ধ হতে নির্দেশ দিয়েছে। নারীকে শুধু পুরুষের শয্যাসংগিনী এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও ভাবে দেখেনি কোরান-হাদীস। ইসলামের শিক্ষায় নারীর বন্দিত্ব ও প্রান্তিকতার কারাগার নিচ্ছিদ্র করার সবরকম বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তার নিজস্ব কোনও চাওয়া-পাওয়ার স্বীকৃতি নেই ইসলামে। তার সব অধিকার তাই খণ্ডিত। একবার কোনও পুরুষের অধিকারভুক্ত হলে তার যৌন শুচিতার ওপর যত জোর দেওয়া হয়েছে, পুরুষের বেলায় তার কিছুই চাওয়া হয়নি। নারী যে আলাদাভাবে একজন ব্যক্তি ইসলামে তার কোনও স্বীকৃতি নেই। ইসলামে নারী তো শয়তানের ফাঁদ। সেই ফাঁদে যাতে নারী পড়ে না যায় তার জন্যই নাকি এত সব সুরক্ষার বেড়াজাল। নারী ইসলামে শুধু নারী-ই। পূর্ণতায় বিকশিত কোনও ব্যক্তি নয়।

নারীর জন্যে কোরান-হাদীস, রসুলের ব্যক্তি জীবন, তার ভিত্তিতে তৈরী শরীয়া-সুন্নত যতই চিরসত্য হয়ে উঠুক মুসলমান নারীর জন্যে তা কোনও মঙ্গল বয়ে আনেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহায়তা ও ঋণ

১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান—কোরান শরীফ, সরল বঙ্গানুবাদ, মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা, ২০০২।
২. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান—কোরান সূত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪।
৩. গিরিশচন্দ্র সেন—কোরআন শরীফ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯।
৪. মাওলানা আজিজুল হক—বোখারী শরীফ, বাংলা ইসলামিক একাডেমি, দেওবন্দ।
৫. রফিকউল্লাহ—হাদীস শরীফ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯।
৬. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ—মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা (অনু) হাবিব আহসান, লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২।
৭. সা'দউল্লাহ—হাদীস সাহিত্যের ইতিহাস, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।
৮. হুমায়ুন আজাদ—নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
৯. শাকিনা হাসীন—নারী ও মৌলবাদ, ঈক্ষণ, ঢাকা, ১৯৯৮।
১০. সৈয়দ আমীর আলী—দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম (অনু) রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা ২০০০।
১০. ওসমান গণি—মহানবী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০১।
১১. আবদুল কাদির (সম্পাদনা)—রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০।
১২. কঙ্কর সিংহ—ইসলাম ও পরধর্ম, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০৫।
১৩. ফরহাদ মজহার—এবাদতনামা, প্রতিপক্ষ, ঢাকা, ১৯৯০।
১৪. শাহ সুফী শেখ শামসউদ্দিন আহম্মদ - হেরা পর্বতের সেই কোহিনূর, ন্যাশনাল প্রিন্টিং-পাবলিশিং লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৩।
১৫. কিছু পত্রপত্রিকা এবং ইন্টারনেট সূত্র।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

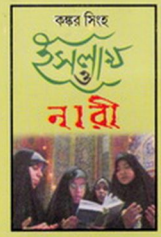

'ইসলাম ও নারী' লেখকের ইসলাম-চর্চার দ্বিতীয় গ্রন্থ। লেখক বর্তমান গ্রন্থে ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান ও মহাগ্রন্থ হাদীস এবং রসুলের আদর্শ ও উত্তরাধিকারে নারীর অবস্থান খুঁজেছেন। পৃথিবীর কোনও ধর্মই নারীকে তার যোগ্য মর্যাদা দেয় নি। ইসলাম ধর্মও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ইসলাম দাবি করে নারীকে এই ধর্ম যা দিয়েছে তা সর্বযুগেই নারীকে গরিয়সী করেছে। লেখক এই দাবীকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এই গ্রন্থে। তাঁর ইসলাম-চর্চা অনেকদিনের। এই গ্রন্থের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ একজন মননশীল, আধুনিক ও সচেতন মানুষের। এর আগে এভাবে কেউ নারী ও ইসলামকে নিয়ে বিশ্লেষণ করেন নি। এটা নিয়ে একটা বিতর্ক হতে পারে। পাঠক এই গ্রন্থে ইসলামকে নিয়ে নতুন ভাবনার সন্ধান পাবেন।

AMARBOI.COM

কঙ্কর সিংহের জন্ম ২৫ জুলাই, ১৯৩৮। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক। পেশাগত জীবন থেকে অবসর নিয়ে কলম ধরেছেন। কিন্তু পটভূমি তৈরী ছিল দীর্ঘদিন থেকে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর চিন্তাধারায় আধুনিকতার ছাপ। প্রথাগতভাবে গবেষণা না করলেও তিনি একজন গবেষক। সেই গবেষণায় খুঁজে পাওয়া যায় বস্তুনিষ্ঠতার স্পর্শ। তিনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সংকট নিয়ে যেমন লিখেছেন তেমনি আলোচনা করেছেন ব্রাহ্মণ্যধর্মে শূদ্রদের অবস্থান নিয়ে। সেই ধর্মের ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে যেমন তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ আছে, তেমনি আছে ইসলাম ধর্মের নীতি-নির্দেশ-বিধান নিয়ে। লেখকের প্রতিটি গ্রন্থই বহুল আলোচিত।

ISBN
Rs. 50
9 788185 459365
TYPICAL IMPRESSION

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~